দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

তৃতীয় বর্ষ ❖ ১ সংখ্যা ❖ ১৭ মে ২০২৬

শিল্পী অজ্ঞাত, হোয়াটস অ্যাপ থেকে প্রাপ্ত

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

- ফ্যাসিবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ — শুভ বসু — ৩
- সুনালী খাতুন বাঙালি জাতিসত্বার মুখ — মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় — ৪
- ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বিজেপির ক্ষমতা বিস্তার আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে — সৌর বসু — ৭

ইতিহাস

- শ্যামাপ্রসাদের বাংলা : ইতিহাস না প্রোপাগান্ডা — ত্রিদিব সান্যাল — ৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি

- রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা — অরবিন্দ দাস — ১২
- কার্ল মার্কস, অর্থনীতি ও বর্তমান সময় — সুবীর মুখোপাধ্যায় — ১৫

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

- ‘ভোটব্যাঙ্ক’-এর মিথ তছনছ করে দিয়েছে রাজ্যের মুসলমানরা — মিলন দত্ত — ১৭
- মসনদ থেকে মমতার বিদায়, সিংহাসনে শুভেন্দু — মজিবুর রহমান — ১৯
- বাংলায় বিজেপি সরকার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ — সুকুমার মিত্র — ২১

দেশের খবর

- অবশেষে বামেদের শেষ দূর্গ হাতছাড়া হল — অমিতাভ সিংহ — ২২
- আসাম : বাঙালি বিদ্বেষের পর এখন উগ্র মুসলিম বিরোধীতা — মনিরুল হক — ২৩
- তামিলনাড়ুর নির্বাচন : নতুন শক্তির উত্থান — শুভাশিস মজুমদার — ২৫
- কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিবৃতি — ২৬
- সুব্রত গুপ্ত ও মনোজ আগরওয়ালের নিয়োগের সমালোচনায় রাহুল গান্ধি — ২৬
- বারাসতে ‘সিরাজ উদ্যান’ থেকে ‘শিবাজি উদ্যান’; নাম বদলে ক্ষোভ — ২৭
- বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায় পুলিশি হেফাজতে — ২৮
- পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলতে হবে, দাবি আরএসএসের — ২৯
- মণিপুরে অপহৃত কুকি ও নাগা মুক্ত — মিলি মুখার্জি — ২৯

ধারাবাহিক

- কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ৩০
- জরুরী অবস্থা ও পরবর্তী পরিস্থিতি — সুশান্ত দাশগুপ্ত — ৩২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

- বন্ধুতার পাতা — সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম : চাই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি , সততা ও আন্তরিকতা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যবাসী জেনেছেন। ২০৭ টি আসনে জয়লাভ করে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন করেছে। গত ৯ মে ২৫ বৈশাখ রাজ্যের প্রথম বিজেপি মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে । শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ।আমরা আশা করবো নবগঠিত বিজেপি মন্ত্রিসভা দলমত ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসীর স্বার্থ রক্ষা করবেন। কোনও রকম সংকীর্ণ ধর্মীয় চিন্তাধারা সরকারি প্রশাসনিক কাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেনা।

১৫ বছর রাজ্য শাসন করার পর তৃণমূল কংগ্রেস শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছে । তাঁদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা ৮০। তৃণমূল সুপ্রিমো ও রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুর আসনে তৎকালীন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাস্ত হয়েছেন। কংগ্রেস ২ টি, সিপিআই (এম)১ টি, তাদের জোটসঙ্গী আই.এস.এফ ১ টি আসনে জয়লাভ করেছে। এছাড়া হুমায়ুন কবির (এ.জে.ইউ.পি) দু'টি আসনে জিতেছেন। এস.আই.আর নামক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাকে লঘু করে দেখা হয়েছে ।মমতা দেবী এই গেম প্ল্যানের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি ।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তি , বাম ,অতি বাম সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । তাঁর এই বিলম্বিত বোধোদয়ের কারণ অবশ্যই তাঁর দলের নির্বাচনী বিপর্যয়। এতদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গে এই ঐক্য গড়ার কোনও চেষ্টাই করেননি। উপরন্তু বাধা দিয়েছেন । তিনি সর্বদাই বলতেন এই রাজ্যে তিনি একাই বিজেপিকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিধর। তাঁর অন্য কোনও দলের সাহায্য নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একটি তৃতীয় বিরোধী জোট করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগ ফলবতী না হওয়ায় তিনি অবশেষে ইন্ডিয়া জোটে যোগ দেন । কিন্তু তাঁর দলের স্তাবকদের দিয়ে তিনি মাঝে মধ্যেই বলাতেন ইন্ডিয়া জোটের উচিৎ দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে রাহুল গান্ধি নয় মমতা ব্যানার্জির নাম তুলে ধরা। এই উদ্যোগ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ছাড়া আর কেউ সমর্থন করেনি । কংগ্রেস দলও জানিয়ে দেয় তারা আদৌ রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রোজেক্ট করার জন্য বলছে না ।

সকলেই জানেন মমতা ব্যানার্জি ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিজেপির সহায়তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। দল গঠনের ২০ দিন পর অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দলের সঙ্গে বিজেপির নির্বাচনী সমঝোতা হয়। ১৯৯৯ সালে তিনি বাজপেয়ী সরকারের রেলমন্ত্রী হন।২০০১ সালে তিনি এন.ডি.এ জোট ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে লড়াই করেছিলেন ।নির্বাচনে সাফল্য না পেয়ে তিনি আবার বিজেপির কাছে ফিরে যান।২০০৪ ও ২০০৬ সালে বিজেপির জোটসঙ্গী হয়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন ।২০০৯ সালে আবার তিনি এনডিএ জোট ছেড়ে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী হন ও তৃণমূল কংগ্রেস ১৯ টি আসনে জয়লাভ করে ।উনি ড. মনমোহন সিং মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে রেলমন্ত্রী হন ।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দুই দল জোট করে বামফ্রন্টকে পরাস্ত করে। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর ১৫ বছর শাসনের সূত্রপাত হয়। ২০১২ সালে অপমানে জর্জরিত হয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ত্যাগ করে । এরপর শুরু হয় বিরোধীদের ওপর আক্রমণ । ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরে জেলাপরিষদে কংগ্রেস ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে বামফ্রন্ট জয়লাভ করে। প্রতিটি জেলা পরিষদ মমতা দেবী ছলে বলে কৌশলে দখল করেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস আসন সমঝোতা করে লড়াই করে। তাদের প্রাপ্ত ভোট ছিলো ৩৯ শতাংশ , আসন ছিলো ৭৭ । বিজেপির ভোট ছিলো ১০ শতাংশ, আসন ছিলো ৩। তৃণমূলের ভোট ছিলো ৪৪, আসন ২০১৪। মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন তিনি বিরোধীশূন্য বিধানসভা ও রাজ্য দেখতে চান । তাঁর সাগরেদরা নেত্রীর এই ইচ্ছে পূরণ করার জন্য নেমে পড়েন ।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর তৎকালীন অন্যতম সেনাপতি শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য করতে পারবে তাদের ৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে। ২০১৮' র পঞ্চায়েত নির্বাচন কেমন হয়েছিল সবাই জানেন ।ইতিহাসে শূন্যস্থান থাকেনা। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮ টি আসনে জয় পেল। দুঃখজনক এই যে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট তাদের সমঝোতা ভেঙে ফেলল। কংগ্রেস মাত্র দুটি আসন জিতলেও বামফ্রন্ট কোনও আসন পেলনা। মমতা দেবী অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে কোনও বিরোধী স্পেস দিতে চাননি । তার সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে তিনি এক বিপজ্জনক খেলা খেলতে গিয়েছিলেন । ওই খেলায় বিজেপি অনেক দক্ষ। ফলে যা হবার তাই হয়েছে । এই রাজ্যে তিনিই বিজেপিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

এই কঠিন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে প্রয়োজন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি , সততা ও আন্তরিকতা ।

প্রবন্ধ

ফ্যাসিবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

শুভ বসু

রবীন্দ্রনাথ এক বিরল প্রতিভার মানুষ ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক হিসাবে সাহিত্যের সমস্ত শাখায় পদচারণা করেছেন । তিনি সেই শিক্ষাবিদ যিনি প্রথমে বিদ্যালয় আর তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং সমাজ কর্মী যিনি শিক্ষাসত্র থেকে শুরু করে শ্রীনিকেতন স্থাপনের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজে সমবায় আন্দোলন এবং কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন এবং শিক্ষাচর্চার মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এর প্রয়াস করেছিলেন। তিনি চিত্র শিল্পী এবং সংগীতের কম্পোজার। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী কর্মকান্ডর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাই নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। আরো অনেক গবেষণা হবে। বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আমাদের প্রেম করা থেকে সংগীতের রসবোধ এবং এমন কি প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্ক নিয়ে নতুন আলোচনার সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বর সঙ্গে ভারতীর সম্মেলন করতে চেয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে তিনি একজন বৈশ্বিক বুদ্ধিজীবী। সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন বিস্তর। রক্ষনণশীল হিন্দুরা তাঁকে কদর্য ইঙ্গিত সহ সমালোচনা করেছেন। গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়েছে বারবার বিজ্ঞান ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে। কিন্তু দুজনের মধ্যে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কিছু মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে হিন্দুত্ববাদের ধারক ও বাহক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে জমিদার শ্রেণীর প্রতিভূ বলছেন । মার্কসবাদীদের একাংশ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন জনগণের আশা আকাংখ্যা থেকে বিচ্যুত বলে , আবার বহু মার্কসবাদী সুশোভন সরকার থেকে শুরু করে আব্দুল হালিম পর্যন্ত রবীন্দনাথের ভক্ত ছিলেন।

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুদূর প্রসারী। রবীন্দ্রনাথ আবার ইউরোপে অনেকের কাছে প্রাচ্যের রহস্যময় পুরুষ বলে পরিচিত হন। সেই সূত্রে ইতালির প্রাচ্যবিদ তুচ্চির মাধ্যমে তিনি মুসোলিনির সঙ্গে পরিচিত হন। রোমারোল্যা আবার তাঁকে মুসোলিনি সম্পর্কে অবহিত করেন। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জাতীয়তাবাদের উগ্রতার তীব্র সমালোচক হয়ে দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকাতে ইথিওপিয়ার উপর ইতালির আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে, নাৎসি বাহিনীর হাতে প্যারিসের পতনের আগের রাতে, আন্দ্রে জিদ কর্তৃক অনূদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ‘দ্য পোস্ট অফিস’ ফরাসি রেডিও জুড়ে পরিবেশিত হয়েছিল। Warshaw ঘেটোতে ১৯৪২ সালে, ট্রেবলিঙ্কায় নির্বাসিত হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে, ইয়ানুশ কোরচাকের তত্ত্বাবধানে থাকা অনাথরা ঘেটোর দেয়ালের ভেতরে ডাকঘর নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে জাপানের চীন আক্রমণের প্রতিবাদ করে নাগুচির সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান। পরে তিনি ‘ সভ্যতার সংকট ‘ লিখে ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন।

আজকের দুনিয়াতে কেউই সরাসরি নিজেদের ফ্যাসিবাদের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে ইউরোপ জুড়ে অভিবাসনকারীদের বিরুদ্ধে একধরণের ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছে। পিম ফোরটুইন (১৯৪৮,২০০২) ছিলেন একজন ডাচ রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং লেখক, যিনি ২০০২ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার আগে অভিবাসন-বিরোধী ও ইসলাম-বিরোধী অবস্থানের মাধ্যমে ডাচ রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি লিস্ট পিম ফোরটুইন (এলপিএফ) দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার জাঁকজমকপূর্ণ, প্রকাশ্য সমকামী ও স্পষ্টভাষী স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন। ন্যাশনাল র‍্যালি (ফরাসি- Rassemblement national) যা ১৯৭২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ফ্রন্ট (ফরাসি- Front National) নামে পরিচিত ছিল, একটি ফরাসি উগ্র-ডানপন্থী রাজনৈতিক দল, যাকে ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী এবং জাতীয়তাবাদী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ২০২২ সাল থেকে এটি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে একক বৃহত্তম সংসদীয় বিরোধী দল। এটি অভিবাসনের বিরোধিতা করে এবং বৈধ অভিবাসনে উল্লেখযোগ্য হ্রাস, ‘ফরাসি পরিচয়’ রক্ষা, এবং অবৈধ অভিবাসনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন জানায়।দলটি ১৯৭২ সালে অর্দ্র নুভো (Ordre Nouveau) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে জঁ-মারি লে পেন; প্রাক্তন নাৎসি (ওয়াফেন-এসএস) সদস্য পিয়ের বুস্কে এবং লিওঁ গলতিয়ে; এবং ফ্রাঁসোয়া দুপ্রার মতো নব্য-নাৎসি সহানুভূতিশীলদের দ্বারা। এবং ফরাসি আলজেরিয়ার জন্য স্মৃতিকাতর সমর্থকেরা, যেমন "Organisation armée secrète"é-এর সদস্য রজার হোলিন্দ্র। অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি জার্মানির একটি উগ্র-ডানপন্থী, ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী, জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীল, এবং ভলকিশ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল। বুন্ডেসটাগে এর ১৫১ জন সদস্য এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ১৫ জন সদস্য রয়েছে। এটি বুন্ডেসটাগের বৃহত্তম

বিরোধী দল এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ইউরোপ অফ সভরিন নেশনস গ্রুপের সদস্য। এর নামটি অ্যাঞ্জেলা মার্কেল এবং তার স্লোগান Alternativlosigkeit (আক্ষরিক অর্থে 'বিকল্প-হীনতা', 'কোন বিকল্প নেই'-এর একটি জার্মান সংস্করণ)-এর মূলধারার নীতির প্রতি এর প্রতিরোধকে প্রতিফলিত করে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর ধরনের রিপাব্লিক্যানিসম বা ব্রিটেনের রিফর্ম পার্টি সবই এই ধরণের অভিবাসন বিরোধী ইসলামফোবিক চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ গুলিতে আধুনিকতা, নারী প্রশ্ন, গণতন্ত্র অমুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রশ্নে আজ সালাফি পন্থী দের উত্থান হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে জামাত এ ইসলামী মূল প্রতিষ্ঠিত বিরোধী দল।

ভারতে ইউরোপীয় উগ্র-ডানপন্থী ও ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী দলগুলো ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থন দেখিয়ে আসছে, বিশেষ করে অভিবাসন-বিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে। ফ্রান্সের ন্যাশনাল র‍্যালি, জার্মানির এএফডি এবং যুক্তরাজ্যের রিফর্ম ইউকে-র মতো দলগুলোর ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং নয়াদিল্লির অবস্থানকে সমর্থন জানাতে প্রায়শই ভারত সফর করেছেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারকারী প্রধান ইউরোপীয় উগ্র-ডানপন্থী দলগুলো ফ্রান্স ন্যাশনাল র‍্যালি (Rassemblement National) মেরিন লে পেনের মতো ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে এই দলটি সাধারণত অভিবাসন-বিরোধী বক্তব্যের সঙ্গে একমত। অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (AfD)। একটি উল্লেখযোগ্য ডানপন্থী দল যা জার্মানিতে চরমপন্থার জন্য নজরদারিতে থাকা সত্ত্বেও সম্পর্ক জোরদার করতে ভারতে সদস্য পাঠিয়েছে। রিফর্ম ইউকে (পূর্বে ব্রেক্সিট পার্টি): নাইজেল ফারাজের দলটি ডানপন্থী বয়ানগুলোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং ভারতের নীতিকে সমর্থন করেছে। ইতালি: লেগা (Lega) ও ব্রাদার্স অফ ইতালি: এই দলগুলো ভারতের রক্ষণশীল পরিমণ্ডলের সঙ্গে আদর্শগত সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে ইতালীয় ডানপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে। পোল্যান্ড এর ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (PiS): সম্পর্ক জোরদার করতে ভারত সফরে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

বাংলাতে এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি মতো দক্ষিণপন্থী দল ক্ষমতায় আহরণ করছে। বাংলায় প্রায়ই ফেস বুকে বহু নামজাদা লেখকের মধ্যে ইউরোপীয় এবং বৈশ্বিক দক্ষিণপন্থার সমর্থনে পোস্ট দেখতে পাই। ভারতে ইউরোপীয় দক্ষিনপন্থার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত ভারতীয় জনতা পার্টি। বাংলায় এই প্রথম তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছেন। তাঁদের অভিবাসন বিরোধী , উগ্রজাতীয়তাবাদী এক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ কে মেলানোর প্রয়াসে রবীন্দ্র জন্মদিনে ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেছেন । আমি তাই একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদী চিন্তার বিরোধী ধারার কথা তুলে ধরলাম।

সুনালী খাতুন বাঙালি জাতিসত্বার মুখ, সেই ভারতমাতা

মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানিং ভারতমাতার জয়গান নিয়ে দেশ তোলপাড়। কারা জয় দিল আর কারা দিল না, তা নিয়ে চুলচেরা হিসেব নিকেশ হয়ে চলেছে। যারা জয়োল্লাসে মাতে তারা কারণ খোঁজে না। কিন্তু সবার কাছেই জানতে ইচ্ছে করে ভারতমাতা কে? এই প্রশ্নটি বহু আগে করেছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি মধ্যরাতে স্বাধীন দেশের পতাকা তুলেছিলেন, সেই জওহরলাল নেহরু প্রশ্নটি করেছিলেন তাঁর বক্তব্য শুনতে আসা জনগণকে। নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' অবলম্বনে নির্মিত শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'ভারত এক খোঁজ ' নামক কিংবদন্তী দূরদর্শন ধারাবাহিকে এই দৃশ্যটি আছে। কেউ বললো দেশের মাটি, কেউ বা ধানক্ষেত, কেউ বা পারিপার্শ্বিক । কিন্তু শেষপর্যন্ত নেহরু এই সত্যতেই এলেন যে ভারতমাতা আসলে ভারতের জনগণ যারা এই দেশটিকে নির্মাণ করেছেন রক্ত ঘাম শ্রম দিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ এক ভারতমাতার ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর শান্ত, সৌম্য, আটপৌরে শস্য শ্যামলা রূপটি বড় সুন্দর। কিন্তু আজকে যারা ভারতমাতার জয় দাবি করেন, তিনি সেই যুদ্ধং দেহি ব্যাঘ্রারুঢ়া অতি উজ্জ্বল সালংকারা দেবি, তিনি চোখ ধাঁধিয়ে দেন। তিনি যাতে সকলের মা না হয়ে ওঠেন, তাকে ব্যবহার করা হয় সহনাগরিকদের প্রতি বিদ্বেষের লড়াইয়ে।

এবার আসি এই সময়ের একটি ঐতিহাসিক দৃশ্যে। অঘ্রাণে শীতের রাতে মালদার মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ভারতে প্রবেশ করলেন মাদার ইন্ডিয়া। সীমান্তরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ভারতীয় নাগরিক সুনালী খাতুন ও তার আট বছরের বালক পুত্র সাবির। ছবিটা আমরা সবাই দেখেছি। এই সীমান্তরক্ষী বি এস এফ ঐ বছর জুন মাসে সুনালী সহ পাঁচ জন যাদের মধ্যে তিনজন নাবালক, তাদের

জোর করে ঠেলে দেয় বাংলাদেশে। সুনালীকে ওপারের সীমানা অব্দি পৌঁছে দিয়ে তার স্বামী দানিশ সেখ এবং সুইটি বিবি ও তার দুই ছেলে, যারা সকলেই ভারতীয় নাগরিক কিন্তু যারা এখনো দেশে ফেরার অনুমোদন পাননি।

সুনালী এবং তার পরিবার এবং বিধবা সুইটি বিবি ও তার ছেলেরা বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা।' বহুকাল ধরে সুনালীরা এ দেশের রাজধানীর বর্জ্য কুড়িয়ে নিজেদের পেট চালান, থাকেন ঝুপড়িতে। নিরুপায় এইসব মানুষের দ্বারাই আধুনিক মহানগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চলে ' কিন্তু এদের তাড়িয়ে বেড়ায় প্রশাসন, বিশেষ যখন তাদের ভাষা বাংলা এবং তারা মুসলমান।'

গত জুন মাসে দিল্লি শহর থেকে তুলে নিয়ে তাদের অসম থেকে ঠেলে দেওয়া হয় বাংলাদেশে কারণ দিল্লীর মতে তারা সন্দেহজনক অনুপ্রবেশকারী, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায় ঘুসপেটিয়া। কোনোরকম নিয়মকানুনের ধারে কাছে না গিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোনোরকম তথ্যানুসন্ধান না করেই তারা এই কাজটি করেন। এক কাপড়ে তাদের বের করে দেওয়া হয়। কীভাবে তারা সম্পূর্ণ নাগরিক পরিচয় বিহীন থেকেছেন, তা শুধু তারাই জানেন।

কিন্তু তাদের সমস্ত কাগজপত্র আছে, যে কাগজপত্রের কারণে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে। তবে তাদের নিজের দেশ ভারত আমার ভারতবর্ষে তারা সন্ত্রাসবাদি রোহিঙ্গা এবং আরো কত কিছু হয়ে গেছিলেন। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চ সুনালীর পরিবারের কাছ থেকে উপযুক্ত নথিপত্র যোগাড় করেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে তাদের কাছে ১৯৫২ সালের জমির দলিল আছে। স্থানীয় মানুষেরাও জানান যে ভোদু শেখের পরিবার বংশ পরম্পরায় বীরভূমের পাইকারে বসবাস করে আসছে।

পাইকরের দর্জিপাড়ায় সুনালীর মা জোৎস্না বিবি তার ক্লান্ত বেদনাহত চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কোন্ কাগজ চান সব আছে। এঁরা কোনদিন চাকরির বাজারে দাঁড়াননি, দিল্লির বস্তিতে এদের বেঁচে থাকা নিয়ে রাষ্ট্র কখনো ভাবেনি , কোনদিন তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি বা এক টাকায় জমির ব্যবস্থা করেনি। রাষ্ট্রের কাছেও সুনালীরা বর্জ্য মাত্র। সুনালীরা এভাবেই প্রায় নিখোঁজ হয়ে থাকেন নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে, তারপর কখন কোথায় ডুবে যান কে জানে।

কিন্তু এই সুনালী লড়াই ছাড়েননি। যে সন্তানের জন্য তিনি পূর্ণ গর্ভ নিয়ে সীমান্তের জঙ্গলে থেকে তারপর বাংলাদেশের কারাগারে ১০১ দিন কাটিয়েছেন, তার জন্ম হয়েছে এই ভারতে। তাকে কোলে নিয়ে সুনালী বলতে থাকেন তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ত্রিশ বছর আগে, সুনালীর বাবা ভাদু শেখ সপরিবার কাজের সন্ধানে দিল্লিতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সেখানে তিনি তিন দশক ধরে রিকশা চালাতেন, আর তার স্ত্রী কাগজ কুড়োতেন। এভাবেই সংসার চলত। বার্ধক্য ভাদুর কাজ করার ক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং দম্পতি বাংলায় ফিরে আসে। সুনালী তার বাবা-মায়ের ভরণপোষণের জন্য গৃহ সহায়িকার কাজ শুরু করে। পরে তিনি দিল্লির বাসিন্দা দানিশ শেখ কে বিয়ে করেন। এই দম্পতি শহরের রোহিণীর ২৬ নম্বর সেক্টরে থাকতেন। দানিশ কিছুটা লেখাপড়া করেছেন। সুনালী এই নিয়ে বেশ গর্বিত। যদিও ভাগ্যের পরিহাসে এখনো দানিশ তার সন্তানের মুখ দেখতে পাননি।

দিল্লি পুলিশ প্রথমে তাদের ক্ষ্মবাংলাদেশিক্ষ্ম সন্দেহে আটক করে। তারপর, চোখ বেঁধে, তাকে, তার স্বামী দানিশ এবং আট বছরের ছেলে সাবির এবং সুইটি বিবি ও তার দুই সন্তানকে বিমানে বসিয়ে আসামে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে থেকে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়। বিধবা সুইটি বিবি (৩৩), একই গ্রামের বাসিন্দা, তার সাথে আছে তার দুই সন্তান, ১৬ বছর বয়সী কুরবান এবং পাঁচ বছর বয়সী ইমান। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এদের। তার উপর আতঙ্ক। সুনালী বলছিলেন সীমান্তরক্ষীরা তাকে এবং সুইটিকে বলতো এগিয়ে যেতে, তারা বুঝতেন যে এগিয়ে গেলেই স্বামী এবং ছেলেদের মেরে ফেলবে, তাই তারা বার বার তাদের পা ধরেছেন।

এই হতদরিদ্র পরিবারের হয়ে লড়েছেন বীরভূমের ভূমিপুত্র সাংসদ সামিরুল ইসলাম এবং রাজ্য সরকার। তাঁকে আজ কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। স্থানীয় সমাজকর্মী মফিজুল ছুটে গেছেন বাংলাদেশে। তাদের সবার উদ্যোগে সুনালীর বিষয়টি আদালতে গেছে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে । গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, কলকাতা হাই কোর্ট কেন্দ্রকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে নির্দেশ মানা হয়নি বরং সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি যায়।

অবশেষে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সুনালি এবং তাঁর আট বছরের ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন।

ওদিকে, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি আদালত অবৈধভাবে বাংলাদেশে নির্বাসিত সকলের জামিন মঞ্জুর করেন। এখানেই সুনালীরা আটক ছিলেন।

এরকমটা আগে কখনো ঘটেছে কিনা জানা নেই। সে দিক দিয়ে ঘটনাটি নাগরিকত্ব, সংবিধান, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের

ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকলো। দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল আজকের ক্ষমতাসীন শাসকের মুসলমানের প্রতি আক্রোশ, দরিদ্র প্রান্তিক নারীর প্রতি অত্যাচারের এবং বাঙালির প্রতি বিদ্বেষের । সবচেয়ে বড় কথা দরিদ্র অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের উপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অমানবিক হস্তক্ষেপ।

তবু হিন্দু রাষ্ট্র জিততে পারেনি, হয়তোবা এখনও গণতন্ত্র বেঁচে আছে, হয়তোবা এখনো জনমত চাপ দিতে পারে, হয়তোবা এখনো সেকুলার শব্দটি ব্রাত্য হয়ে যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা এখনো এই পৃথিবীতে এই দেশে সুনালীর মত কাগজ-কুড়ানিদের পাশে দাঁড়ানোর মানুষ আছে তাদের জন্যও ন্যায় আছে।

না সুনালী এবং তার অজাত সন্তানের জন্য এই সেদিন পর্যন্ত কোন চ্যানেলে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া যায়নি, কোন বিশেষজ্ঞের আসর বসেনি, বুম নিয়ে যারা বস্তিতে বস্তিতে নাগরিক তাড়াচ্ছিলেন তাদেরও কাউকে দেখা যায়নি। এখন ঠেলায় পড়ে খবর হচ্ছে সুনালীর। খবর হচ্ছে সুনালীর বাবা মায়ের নাম ২০০২ এর ভোটার তালিকায় আছে। অতএব এস আই আর দিয়ে সুনালীকে বেনাগরিক করা যাচ্ছে না, খবর হচ্ছে মানবিক সরকারের যাদের মানবিকতার পরাকাষ্ঠা হল গর্ভবতী নারীকে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া। আজ যদি সুনালীর সন্তান জন্ম নিতো বাংলাদেশে তাহলে এই দেশের মুখ কোথায় উজ্জ্বল হত কে জানে। এই উপমহাদেশ তথা গোটা দুনিয়ায় বিশ্ব গুরুর কি সম্মান থাকতো?

বাংলা বলছে শুধু এই সন্দেহে দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত রাজ্য, একদা বাঙালির মতাদর্শের দোসর কেরালায় এভাবে মারা হয় ছত্তিশগড়ের রামকে । তার চেয়েও বড় প্রশ্ন কিন্তু আজ এটাই যে সমাজের নির্ণায়ক হয়ে যারা আছেন, এইসব মৃত্যুতে সেই বাঙালির কিছু যায় আসে না। বাঙালি আজ পুনরায় বাঙালি ও মুসলমানে ভাগ হয়ে গেছে শরৎবাবুর খেলার মাঠে।গ্ধ তাতেও শেষ নয়। দেশজুড়ে সরকারি নির্বাচন কমিশন ঘুসপেটিয়া খুঁজছে, রোহিঙ্গা খুঁজছে, আসলে খুঁজছে বাঙালি।

এর পিছনে ইতিহাস কিছু আছে, যা সবাই জানে। তবে তা একালের ইতিহাস নয়। বাঙালি বরাবরই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। কারণ একভাবে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল মাৎস্যন্যায় পরবর্তী বৌদ্ধ আন্দোলন দিয়ে। আদি বাংলার চর্যাপদ লোকায়ত দর্শনের ধারক। পরে সেন রাজারা এসে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ আমদানি করে, সমাজে বৈষম্যের প্রকোপ বাড়ে। পরবর্তী সুলতানি যুগে বাংলা তার অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুকেই বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। এরই মধ্যে গোটা দেশের মত এখানেও ধর্মীয় সংস্কার হয়েছে চৈতন্য ভাবনায়। দীনেশ চন্দ্র সেন যেমন দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষাটাই যে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা থেকে এসেছে, সেটাই তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি আজ বিস্মৃত । এই বিস্মরণ ও শুধু মুসলমানদের বাইরে ঠেলে দেওয়া নয়, নিজেদের উৎসটাকে অস্বীকার করা। পলাশীর পরে ঘটনা পরিবর্তিত হয়, আর সেই সময় ইংরেজ বণিকের ছত্রছায়ায় অন্য এক নগরকেন্দ্রিক সমাজের পত্তন হয়। লোকায়ত সমাজের সাথে ভদ্র বাঙালির বিচ্ছেদ বাড়তেই থাকে।

কিন্তু ভদ্র বাঙালি উত্তর ভারতীয় হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে গেছে তথাকথিত এনলাইটেনমেন্টের ধারায়। ব্রাহ্মবাদীরা সতীদাহ প্রথা অবলুপ্ত করা, মেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদিতে উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও এসেছেন। কিন্তু ভদ্রজনের ইতিহাসে লেখা হয়নি রামমোহনের কিছু পরে আর্বিভূত হওয়া হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা যিনি বাংলার লোকায়ত সমাজে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন স্ত্রী পুরুষ সাম্য, শিক্ষা এবং জাতপাত ভেঙে দিয়ে।

ঔপনিবেশিক শাসক এই প্রতিবাদী চেতনার ভদ্রলোক অংশটিকে কেরাণীতে পরিণত করে, চিরকালীন সরকারি চাকরির মোহে ফেলে দেয়। তবু এরই মধ্যে জাতীয়তাবোধ নিয়ে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি। সেলুলার জেলে আটক বাঙালির নাম পড়ে শেষ করা যায় না, জেলা ধরে ধরে এই নাম দেখা যায় যারা কেউ মুচলেকা দেননি। আমাদের সত্তার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল, আজও যা বিনষ্ট করা যায়নি। বাঙালি এমনকী বঙ্গভঙ্গ কেও একদা রদ করতে পেরেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাংলা ভাগ হয়েছে। সেই নিষ্ঠুর করুণ ইতিহাস বাঙালির মজ্জায় রয়েছে, আর তখন সবচেয়ে বেশি দুর্গতি হয়েছে সাধারণ মানুষের।

পরবর্তী সাত দশক সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে গেছে সময়। আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি রাষ্ট্র ব্যাপী বাঙালি নির্যাতনের সামনে কিন্তু তবু একটা বড় অংশ ভাবছেন, সব ঠিক আছে। এস আই আরে লক্ষ লক্ষ ঘুসপেটিয়া ধরা পড়বে বলে আহ্লাদিত নাগরিক গোদী মিডিয়ার খবরে মেতে উঠছেন যতক্ষণ না তার ৯২ বছর বয়সী মায়ের ডাক পড়ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদে স্পষ্ট লেখা আছে গর্ভবতী নারী সে অপরাধী হোক সে দেশহীন হোক তার প্রতি অত্যন্ত মানবিক ব্যবহার গ্ধ করতে হবে।গ্ধ কোন অবস্থাতেই তাকে বা তার অজাত সন্তানকে কোনরকম শারীরিক বা মানসিক নিগ্রহের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না।গ্ধ এদেশে সংবিধানের ২১ ধারা অনুযায়ী জীবনধারণ ও

সম্মানের অধিকার সকলের। পাশাপাশি মেয়েদের মর্যাদা ও তাদের সুরক্ষার কথা বারবার বলা হয়েছে। ২০১১ সালে একটি মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে, একজন গর্ভবতী মহিলাকে তার আর্থসামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন তাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতেই হবে, এটি একজন মহিলার জন্ম দেওয়া সংক্রান্ত অধিকার।

এই নিয়ে যাদের আন্দোলনের দরকার ছিল তাদের কিন্তু তেমনভাবে দেখা গেল না। মনে হয় শ্রেণীগত দূরত্ব ছাড়াও আর একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি সাম্প্রদায়িকতা। শ্রমজীবী বাঙালি আক্রান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত সে মুসলমান, তাই হয়ত বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তের চিন্তায় তার স্থান নেই।

কেবলমাত্র ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররাই প্রকৃত বাঙালি, বাকিরা নয় এ ভাবনাটাই ভয়ঙ্কর। মুখের ভাষা শেষ অবধি এই শ্রমজীবী মানুষেরাই ধরে রাখেন। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সবাই তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ান, তাদের বাংলাটা আসে না বলে কত আহ্লাদ, আবার ভাষার শুদ্ধতা নিয়েও তাদের অনেক বক্তব্য, কিন্তু এই মানুষরা যারা শত নির্যাতনেও ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন, তাদের জন্য একটা মিছিলেও কেউ পা মেলালেন না, বড় বিস্ময় লাগে।

সীমাহীন দ্বিচারিতা, শ্রেণী ও ধর্মের বিভাজন কখনো কোনো সফল আন্দোলন গড়তে পারে না। যে রাজ্য থেকে তারা বিতাড়িত হচ্ছেন, সেখানে বসবাসকারী বাঙালি মধ্যবিত্তের তরফেও কোনো প্রতিবাদ দেখা গেল না। বরং অন্য ভাষাভাষী সংবাদ মাধ্যম, স্বাধীন সাংবাদিক তাদের খবর করছেন।

সর্বভারতীয় স্তরে বেশ কিছু গণসংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এখন অপেক্ষা বাকিদের ফিরিয়ে আনার। অদ্ভুতভাবে মানবাধিকারের দাবিতে সুনালী ফিরলেন, কিন্তু তার স্বামীকে এখনো ফেরানো হল না।

কিন্তু আজ সুনালী খাতুনই বাঙালি জাতিসত্ত্বার মুখ। শুধু তাই নয়, বড় করে দেখলে তিনিই ভারতমাতা। তিনি এ দেশের এ রাজ্যের প্রান্তিক শ্রমজীবী মুসলমান পরিযায়ী নারী শ্রমিক, শুধু মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলা ও ধর্মের জন্য তাঁকে বেনাগরিক বলে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল ।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতা বিস্তার আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে

সৌর বসু

কমিউনিজমের ভূত এখনও ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) তাড়া করে বেড়ায়।এখন ভারতে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই কোনও কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় নেই। তবুও নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতায়;বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জয়ের পরে;কমিউনিস্ট, তআরবান নকশালদ এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি বারবার উঠে আসে। এতে মনে হয়, শাসক দলের কাছে কমিউনিজম এখনও মূল প্রতিপক্ষ, হয়তো কংগ্রেসের থেকেও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক পরিবর্তন জনমানসে পরিবর্তনের পুনরাবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। যখন তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্টকে পরাজিত করেছিল, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে দীর্ঘদিনের সিপিআই(এম)-কেন্দ্রিক আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসার সময় এসেছে। সুশীল সমাজের একাংশের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, এই পরিবর্তনের ফলে আগের শাসনব্যবস্থার কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হবে।

কিন্তু বামফ্রন্টের শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচয়ভিত্তিক ও কল্যাণমূলক রাজনীতিতে রূপান্তর প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে পারেনি। বরং অনেকের মতে, এর ফলে নতুন ধরনের রাজনৈতিক অসুস্থতা জন্ম নিয়েছে;যেখানে গুন্ডামি, জবরদস্তি এবং ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে দরিদ্র মানুষের কাছ থেকেও অর্থ আদায়ের সংস্কৃতি বেড়েছে। সমাজতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা একে ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্থনীতিদ বলে বর্ণনা করেন, যেখানে স্থানীয় ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি অনেকটাই স্বায়ত্তশাসিত ও দায়মুক্তভাবে কাজ করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু নাগরিক, এমনকি সুশীল সমাজের সদস্যরাও এই পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েন এবং নতুন রাজনৈতিক বিকল্পের খোঁজ শুরু করেন। আশা ও হতাশার এই দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আনে;আগামী পরিবর্তন কেমন হবে?

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রূপান্তর হয়তো গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করবে না; বরং

সমাজকে আরও কঠোর ও সংখ্যাগুরুবাদী কাঠামোর দিকে ঠেলে দিতে পারে;যা অনেকের আশঙ্কায় একটি 'সনাতনী' বা 'মনুবাদী' সামাজিক ব্যবস্থার রূপ নিতে পারে, বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে।

বর্তমানে ভারতের ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২১টিতে বিজেপি ও তাদের মিত্ররা ক্ষমতায় রয়েছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার সময় বিজেপি ও তাদের মিত্ররা মাত্র আটটি রাজ্য শাসন করত। ক্ষমতায় আসার পরপরই বিজেপি হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। গত বারো বছরে বিজেপি ও তাদের মিত্ররা আটটি রাজ্য থেকে বৃদ্ধি পেয়ে একুশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করেছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অভাবনীয় রাজনৈতিক সাফল্য।

তবে সমালোচকদের মতে, এই সব নির্বাচনী জয় শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। অর্থবল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেমন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং এমনকি নির্বাচন কমিশনের প্রভাব ব্যবহারের অভিযোগও প্রায়ই ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রায় আড়াই লক্ষ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। ভোটগ্রহণ তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ হলেও, নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা এত বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ফলে প্রশ্ন ওঠে;একটি নির্বাচনকে সত্যিই 'শান্তিপূর্ণ' বলা যায় কীভাবে?

এ বছরের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন নানা কারণে ব্যতিক্রমী ছিল। তবিশেষ নিবিড় সংশোধনদ-এর নামে (Logical Discrepency) ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।এই বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিচারপতিদের এই প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি করার জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা । এতদসত্ত্বেও ৩৩ লক্ষ ভোটার ভোটাধিকার ফিরে পেলেও ২৭ লক্ষ ভোটার ভোটাধিকার ফিরে পাননি । এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও ৫ লক্ষ ভোটারের নাম । মোট ৩২ লক্ষ নাগরিক শরিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ।

নির্বাচনের সময় জেলা প্রশাসনকেও ভোটার তালিকা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে বদলি করা হয়। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রায় ৩২ লক্ষ নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি বলে অভিযোগ ওঠে। ফলে অনেকেই এই ফলাফলকে 'খণ্ডিত জনাদেশ' (fractured mandate) বলে অভিহিত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, বিজেপির ধারাবাহিক জয়কে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কৌশল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; এর সঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অপব্যবহার গভীরভাবে যুক্ত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী ঐক্যের কারণে বিজেপি ও তাদের মিত্ররা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী দুই বছরের মধ্যেই বিজেপি মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা , দিল্লি, বিহার এবং অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। এর ফলে বিজেপি ও তাদের মিত্ররা এখন ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ক্ষমতাসীন।

কিছু সমালোচকের মতে, বিজেপির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো ভারতে একটি প্রভাবশালী একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও তারপর সংবিধান বাতিল করা । এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, দেশ ধীরে ধীরে বহুদলীয় গণতন্ত্র থেকে কার্যত একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে এগোতে পারে। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে শক্তিশালী হয়ে ওঠা আঞ্চলিক দলগুলি ক্রমশ প্রভাব হারাচ্ছে। আঞ্চলিক দলগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বিজেপির ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মাত্র একটি আসন ছিল। আজ, পনেরো বছরের মধ্যে দলটি ২০০-রও বেশি আসন পেরিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তাদের প্রচার কৌশলেও বড় পরিবর্তন আনে। আগে প্রচার ব্যক্তিগত আক্রমণ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। পরে সেই প্রচার ধর্মভিত্তিক মেরুকরণের দিকে মোড় নেয়। হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে ইসলামভীতির(Islamophobia)আশঙ্কা ছড়ানো হয়, অনুপ্রবেশকে প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' ধরনের স্লোগান রাজ্যজুড়ে প্রচার করা হয়। এই কৌশল রাজনৈতিকভাবে সফল প্রমাণিত হয়। ভোটদানের হার ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি তথা শেষ প্রতিরোধ;মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার;পরাজিত হয়।

এখন ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন খুব দূরে নয়। বিজেপি নিঃসন্দেহে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যদি তা ঘটে, তাহলে ভারতের গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী চরিত্র গুরুতর সংকটে পড়তে পারে। বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী সামাজিক কাঠামো আরও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

অনুমান করা যায় বিজেপি ইতিমধ্যেই বিপুল সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে । তাই ইন্ডিয়া জোটভুক্ত বিরোধী দলগুলিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শক্তিই বিজেপির বিস্তারকে রুখতে সক্ষম হতে পারে। আঞ্চলিক দলগুলিকে নিজেদের পারস্পরিক সংঘাত ও রাজনৈতিক বিবাদ বন্ধ করতে হবে। এটাই আজ বিরোধী রাজনীতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি।

বিরোধী শিবিরকে নিজেদের পুনর্গঠন করতে হবে এবং আরও বৈজ্ঞানিক ও সমন্বিত রাজনৈতিক কৌশল তৈরি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে। নচেৎ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী ও বহুদলীয় গণতন্ত্র ধীরে ধীরে একটি আরও একরৈখিক (monolithik) রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবে ।

ইতিহাস

শ্যামাপ্রসাদের বাংলা : প্রকৃত ইতিহাস না প্রোপাগান্ডা ?

ত্রিদিব সান্যাল

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন,কলকাতা বন্দরের নামকরণ করা হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে। গত ৩ জুন,২০২০ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই ঘোষণা অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিসভার যুক্তি বাংলার মানুষের আবেগের কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।মনে রাখা দরকার বহু আগে থেকেই কলকাতা বন্দরের অধীনে ডকের নাম ছিল নেতাজি সুভাষ ডক ।

এখন প্রশ্ন হল বাংলার মানুষ কী এমন আবেগ প্রকাশ করলেন যে অনন্যসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষের নামের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শ্যামাপ্রসাদের নাম চাপিয়ে দেওয়া হল ? শ্যামাপ্রসাদের নামে ওই বন্দরের নামকরণ করতে হবে এরকম দাবি অতীতে কখনও বাংলার মানুষ দূরের কথা বিজেপি দলও উত্থাপন করেছিল বলে জানা নেই।

হিন্দুত্ববাদি শক্তি যখনই ক্ষমতায় বসে তখনই তারা তাদের রাজনৈতিক মতের গুরুদের নাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর অযৌক্তিক ভাবে চাপিয়ে দেয় ।এই গুরুরা সবাই ছিলো ব্রিটিশের সহযোগী । তা হলেও তাদের কিছু যায় আসেনা ।স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পরিবর্তন করে জাতীয় নেতৃবৃন্দের একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে স্থাপন করা সংঘ পরিবারের পুরোনো কৌশল। কিছুদিন হল তাঁরা বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনক শ্যামাপ্রসাদ । কেন কি কারণে ? সঙ্ঘের বক্তব্য শ্যামাপ্রসাদের দাবিতেই নাকি ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয় । এই দাবির পিছনে আদৌ কোনও সারবত্তা আছেকি ? প্রকৃত ইতিহাস কি বলে ?

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ ও এম.এ পাশ করেন। এখান থেকে বি.এল এবং বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসলেও তিনি তাঁর স্বনামধন্য পিতার সহযোগী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন।১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার(বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি)নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের সমর্থনে জয়লাভ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস গান্ধিজির ডাকে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সম্ভবত তিনি অনুমান করেছিলেন যে লবণ আইন ভাঙার আন্দোলনে যোগ দিতে হবে ও এর জন্য কারারুদ্ধ হতে হবে ।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের আগে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন ও একই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ওই নির্বাচনে বাংলা বাদে ৮ টি রাজ্যে জয়ী হয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে।সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সমর্থনে মুসলিম লিগ বিরোধী দলগুলির মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়যুক্ত হয়। ওই প্রদেশের অবিসংবাদিত জননেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধি খান আব্দুল গাফফার খান। বাংলায় কংগ্রেস একক বৃহত্তম পার্টি হলেও ত্রিশঙ্কু আইনসভা হওয়ায় মন্ত্রিসভা গঠন করেনি।ফলে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লিগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।হক সাহেব হন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতবাসীর মতামত না নিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা যুদ্ধে ভারতবর্ষকে অংশীদার করার প্রতিবাদে ৮ টি রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ক্ষমতা ত্যাগ করে।কগ্রেসের আহবান ছিল এই যুদ্ধে 'না এক ভাই না এক পাই।' ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যুদ্ধে ভারতবাসীকে

জড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সারা দেশে কংগ্রেস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। ৩০ হাজার সত্যগ্রহী সহ কংগ্রেসের প্রধান নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যান।

এই সময় ব্রিটিশ সরকার সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুটি পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। কী আশ্চর্য ! এই দুই সরকারেরই শরিক ছিল মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা ! লিগের নেতা গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা ও সরদার ঔরংজেব খান তখন যথাক্রমে সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী (তখন রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) হন। ক্ষমতা ভোগ করার জন্য এই সব ধর্মভিত্তিক দল কি নীতি গ্রহণ করতে পারে এই জোট তার উজ্জল দৃষ্টান্ত।তখন শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সর্ব ভারতীয় সভাপতি।১৯৩৯ সালে সাভারকর তাঁকে ওই পদে মনোনীত করেন।

সাভারকর ১৯২৩ সালে ' হিন্দুত্ব ' পুস্তক রচনা করেন এবং সর্বপ্রথম ' দ্বিজাতিতত্ত্ব ' প্রচার করেন। ওই পুস্তকে তিনি বলেন হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। কারণ মুসলমান ও খ্রিস্টানদের পবিত্রভূমি হচ্ছে মক্কা ও জেরুজালেম।তাই তাদের আনুগত্য বিদেশের প্রতি । কিন্তু হিন্দুদের পবিত্রভূমি হচ্ছে গয়া , বারাণসী , পুরী ইত্যাদি । কাজেই মুসলমান ও খ্রিস্টানরা কোনোদিনও হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে পারবেনা।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশন থেকে তারা প্রথম ' পাকিস্তান ' দাবি গ্রহণ করে।ভিত্তি ছিল ওই দ্বিজাতিতত্ব। লীগ সিন্ধের আইনসভায় পাকিস্তান দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পাস করে। হিন্দু মহাসভা কোনও বিরোধিতা করেনি। বাংলার কৃষক প্রজা পার্টির(কে.পি.পি) নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নার আমন্ত্রণে যোগ দেন ও পাকিস্তান দাবি সমর্থন করেন।পরে অবশ্য কে.পি.পি'র সঙ্গে জিন্না ও মুসলিম লীগের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে হক সাহেব লিগ দলকে বাদ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা ও কিছু নির্দল সদস্যের সমর্থনে বাংলায় সরকার গঠন করেন।এই মন্ত্রিসভাকে হক-শ্যামা ক্যাবিনেট বলা হত। হক সাহেব রাজনীতিতে ছিলেন অস্থিরমতি।পাকিস্তান দাবি থেকে কিন্তু তিনি সমর্থন তুললেন না।তা সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার হক সাহেবের সঙ্গে এই জোট করতে কোনও অসুবিধাই হল না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস মিশনের দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা ও ভারতবাসীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোনও সন্ধি করবেনা। বোঝা গেল ১৯৪২ এর আগস্টেই কংগ্রেস চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দিতে চলেছে। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এই দুই সংগঠন হিন্দু যুবকদের দলে দলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানায়। মুসলিম লিগও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতার কৌশল গ্রহণ করে। এই সময় বাংলার লে.গভর্নর জন আর্থার হারবার্টকে বাংলার উপ প্রধানমন্ত্রি শ্যামাপ্রসাদ কী লিখলেন দেখা যাক —

'..... Let me now refer to the situation that may be created in the province as a result of any widespread movement launched by the Congress. Anybody– who during the war– plans to stir up mass feeling– resulting internal disturbances or insecurity– must be resisted by any Government that may function for the time being. শ্যামাপ্রসাদ এই চিঠিতে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলার সরকার ও তার জোটের শরিক হিন্দু মহাসভা এই রাজ্যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে পরাস্ত করার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি এই জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দেন।

তিনি লেখেন– 'The question is how to combat this movement 'Quit IndiaV in Bengal' The administration of the province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress– this movement will fail to take root in the province. It should be possible for us– especially responsible Ministers– to be able to tell the public that the freedom for which the Congress has started the movement– already belongs to the representatives of the people. In some spheres– it might be limited during the emergency. Indians have to trust the British– not for the sake for Britain– not for any advantage that the British might– but for the maintenance of the defense and freedom of the province itself. You– as Governor– will as the constitutional head of the province and will be guided entirely on the advice of your Minister.' ---- এই হচ্ছে আগস্ট আন্দোলনের সময় শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার ভূমিকা।

শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভায় যোগদান প্রসঙ্গে সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কি লিখেছেন দেখা যেতে পারে।উনি তখন ময়মনসিংহ জেলার ডিস্ট্রিক্ট জজ

ছিলেন। তিনি লিখেছেন; 'ইতিমধ্যেই হিন্দু মহাসভা ত্রিপুরা নোয়াখালি অঞ্চলে সক্রিয় হয়েছিল। একদিন ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আসেন সেই সুবাদে। সিভিল সার্জেন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁকে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ করেন।আমাকেও। পাশাপাশি আসনে তিনি ও আমি মেঝের উপর বসি। আমার পুত্রবিয়োগের কথা শুনে শ্যামাপ্রসাদ ব্যথিত হন। মানুষটি পরদুঃখকাতর।তাঁর দরদের দ্বারা তিনি আমার হৃদয় জয় করেন। কিন্তু এমন হৃদয়বান মানুষ কি শুধু হিন্দুদেরই ব্যথার ব্যাথী হবেন? মুসলমানদের জন্য কি তাঁর অন্তরে স্থান থাকবে না? আমি তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করি ' আপনি কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিলেন কেন? ' শ্যামাপ্রসাদ অকপটে স্বীকার করেন, 'কংগ্রেসে আগে থেকে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কি আমাকে এত সহজে এত উচ্চে উঠতে দিতেন'?

হিন্দু মহাসভায় গিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দলপতি হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতারা তাঁকে রাতারাতি উপরে উঠতে দিতেন না। তবে তাঁর পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে যেমন যোগ্যতা, একবার কংগ্রেস টিকিটে আইনসভায় যেতে পারলেই তিনি নিজ গুণে নিজের স্থান করে নিতেন। কিন্তু কংগ্রেস তো যে কোনও দিন জেলযাত্রা করতে পারে। কে জানে কতকাল জেলে গিয়ে পচতে হবে।জেলে না গেলে কেউ কংগ্রেস নেতা হয়না। হিন্দু মহাসভাই সেদিক থেকে শ্রেয়। মুসলিম লীগও। কংগ্রেসের এই দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল অন্য পন্থা বেছে নিয়েছে (যুক্ত বাংলার স্মৃতি,অন্নদাশঙ্কর রায়,পৃ-৭২)।'

সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ডায়েরি ' লিভস ফ্রম এ ডায়েরি ' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৯-১৯৪৬ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ। এটি পড়লে জানা যায় শ্যামা বাবু ও হিন্দু মহাসভার কাজই ছিল হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব বাঁধানো। এই কাজে সব চাইতে সহায়ক ছিল মুসলিম লিগ ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। এই বিদেশি রাজের বিরুদ্ধে শ্যামা বাবু , হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস এর কোনও ভূমিকাই ছিলনা। এই সাম্প্রদায়িক শক্তি কংগ্রেস ও নেতাজি সুভাষ উভয়েরই বিরুদ্ধে। নেতাজি সুভাষ তাঁর Indian Struggle (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম , ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা) গ্রন্থে লিখেছেন চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর অনুরোধ সাভারকর ও জিন্না প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । তাঁরা দু' জনেই সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন তাঁরা ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে যাবেন ।

শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের জনক ? বিজেপি দল ইদানিং এই প্রচারটি চালাচ্ছে। বলছে ' শ্যামাপ্রসাদের বাংলা !' ইতিহাসে এই প্রচারের স্বপক্ষে কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই। মনে রাখতে হবে দেশভাগ হয়েছিল বলেই বাংলা ভাগ হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে আগত ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে দেশভাগ ও বাংলাভাগের কোনও প্রস্তাবই ছিলনা। ব্রিটিশ প্রশাসনের মদতে বিভিন্ন রাজ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে মুসলিম লীগ ওই প্রস্তাব কার্যকর করা অসম্ভব করে তোলে।এই পরিস্থিতিতে দেশভাগ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয় দেশভাগ হলে বাংলা ও পাঞ্জাবও ভাগ করতে হবে।কেননা ওই দুই রাজ্যের যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ও হিন্দু - শিখ ধর্মাবলম্বী।এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। জিন্না ও মুসলিম লিগের দাবি ছিল গোটা দুই রাজ্য যথা পাঞ্জাব ও বাংলা ।

এক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এইটলি কংগ্রেসের বক্তব্য গ্রহণ করেন। শর্ত ছিল ওই দুটি রাজ্যের আইনসভায় পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গ অংশের বিধায়কদের ভোট নিতে হবে।২০ জুন, ১৯৪৭ তারিখে বাংলার আইনসভার অধিবেশনে বাংলার পশ্চিম অংশের সদস্যরা ৫৮ - ২১ ভোটে ভারতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন।এই ৫৮ জনের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন কংগ্রেস দলের সদস্য। হ্যাঁ একথা ঠিক শ্যামাপ্রসাদ বাংলাভাগের পক্ষে ছিলেন,কিন্তু তাঁর দলের তো সমগ্র আইনসভায় মাত্র ১জন সদস্য ছিলেন। ওই শ্যামাপ্রসাদ। তাও জিতেছিলেন অত্যন্ত ছোট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে।

১৯৪৬ এর নির্বাচনে বাংলায় হিন্দু মহাসভা ২% ভোটও পায়নি। এর পরও বলতে হবে 'শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের জনক'? আর ওই ৫৮ জনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণও ছিলেন। ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গ পৃথক রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুখ্যমন্ত্রী হন ড. প্রফুল্ল ঘোষ। তিনি পদত্যাগ করলে ১৯৪৮ এর জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী হন ডা. বিধান চন্দ্র রায়।

শ্যামাপ্রসাদ কখনো স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি,মুসলিম লিগের পরিপূরক শক্তি হিসেবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করেছেন। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর পণ্ডিত নেহরু যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন, তাতে সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দিতে শ্যামাপ্রসাদকে অন্তর্ভুক্ত করেন।গান্ধিজির সচিব প্যারেলাল নায়ার লিখিত ' Mahatma Gandhi - the last phase ১৯৪৬- ১৯৪৮ ' থেকে জানতে পারছি ৩০ জানুয়ারির কথা। গান্ধিজির জীবনের শেষ দিন। গান্ধিজি প্যারেলাল কে বলেছিলেন, যেন সে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে হিন্দু মহাসভার নেতাদের উত্তেজনাপূর্ণ হিংসাত্মক বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে। ৩০ জানুয়ারি সকালে গান্ধিজি

প্যারেলালের কাছে জানতে চান সে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছে কিনা। প্যারেলাল জানান তিনি শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মহাত্মা গান্ধির অনুরোধ জানান। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। এই কথা শুনে গান্ধিজি খুবই দুঃখিত হন।

৩০ জানুয়ারি বিকেলে গান্ধিজি নিহত হন। এর পর শ্যামাপ্রসাদ বাবু জনরোষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দিল্লীর বাড়িতে দরজা জানালা বন্ধ করে পুলিশ পাহারায় কয়েকদিন বসে ছিলেন। তারপর তিনি হিন্দু মহাসভা থেকে ইস্তফা দেন। কিছুদিন চুপ করে থাকার পর ইনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন ও আর.এস.এসের সংঘ চালক গোলওয়ালকরের সহায়তা নিয়ে 'ভারতীয় জনসংঘ' নামক দল গঠন করেন।

শ্যামাপ্রসাদের নাম কলকাতা বন্দরে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামের ওপর স্থাপন করা হল নরেন্দ্র মোদির অনবদ্য কৃতিত্ব।তিনি ২০২১ এর ২৩ জানুয়ারি কলকাতা বন্দরে এক অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর নামে কলকাতা বন্দরের নামকরণ করেন । ওইদিনই ওঁর উপস্থিতিতে নেতাজির জন্মদিনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে ' জয় শ্রী রাম ' শ্লোগান দেওয়া হয়।নেতাজির ' জয় হিন্দ ' ধ্বনি শোনা যায়নি। উপলক্ষ্য ছিলো নেতাজির জীবনীর ওপর এক প্রদর্শনী উদ্বোধন।

এখন বলা শুরু হয়েছে 'শ্যামাপ্রসাদের বাংলা'। বিজেপি মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের আগে বহুল প্রচারিত দৈনিক গুলিতে সচিত্র বিজ্ঞাপনে দেখা গেল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সারিতে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর ছবি। আশ্চর্য ! বাংলার নব জাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় , পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র সকলকে বাদ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ? স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নেতাজি সুভাষ , বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল,মাষ্টারদা সূর্য সেন, বিনয় বাদল দীনেশ , সতীশ চন্দ্র সামন্ত , মাতঙ্গিনি হাজরা ; এঁদের কারো বাংলা না ।আমাদের রাজ্যের প্রথম চারজন স্বাধীনতা সংগ্রামী মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষ , ডা. বিধানচন্দ্র রায় , প্রফুল্লচন্দ্র সেন , অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সকলেই ব্রাত্য। কারণ রাষ্ট্রবাদের প্রোপাগান্ডায় এই বাংলা এমন 'শ্যামাপ্রসাদের বাংলা'।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ললিতকলা ও সংগীতের স্থান

অরবিন্দ দাস

বিশ্বভারতী স্থাপনের আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সংগীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় এ কথা পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটি বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।'

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংগীত অভিনয় ও ললিতকলাকে পুনরায় আসন দেবার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে তা কার্যকর করে তুলেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু ললিতকলা ও সংগীত ছাড়াও প্রকৃতি, হস্তশিল্প এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় যুক্ত হয়েছিল ।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনার ব্যাপ্তি ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাবে মেনে নিতে পারেনি। 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। ... প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনা।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতিকে বড়ো স্থান দিয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে তপোবন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অরণ্যের মধ্যে স্থাপিত। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ঋষিরা ছিলেন শিক্ষক, তাঁরা সর্ববিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রদান করতেন, যেমন- ধর্ম, গার্হস্থ্য জীবন, চিকিৎসা, সাহিত্য, সৌন্দর্যচর্চা, শিল্পকলা, নাট্যকলা ইত্যাদি, এই ধারা আমাদের দেশে দীর্ঘদিন প্রবর্তিত ছিল। বৌদ্ধযুগের বিস্তৃতি ঘটেছিল ব্যাপকভাবে , কিন্তু তা ছিল কেন্দ্রীভূত । উদাহরণ হিসেবে নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিদ্যায়তন গুলির নাম করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। কালের চক্রে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সর্বশেষ পরিবর্তন হয় ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে । এই ঔপনিবেশিক সভ্যতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিকেন্দ্রীভূত গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বড়ো ধরনের

বিপর্যয় নেমে আসে। এই সভ্যতার প্রভাবে লোকায়ত শিক্ষার উপকরণগুলি হীন হয়ে পড়ে। ফলে লোকসাহিত্য, লোকশিল্পের উপর আঘাতটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে ছিলো তার বিবরণ দিতে গিয়ে 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে লিখছেন ক্ষ্মসকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবল মাত্র কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুন্সেফগিরি প্রভৃতি ভদ্রসমাজ প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাকা ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে যাওয়ায় সামাজিক উন্নতি এক ভিন্ন চরিত্র পেয়েছিল। বিদ্যালয় জীবন বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে কী ভাবে পীড়িত করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তঃসার শূন্যতা তাঁকে ব্যথিত করেছে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে এ কথাই তিনি বলেছেন- 'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয়না। আমরা বাল্যকাল হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদন্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না।'

উনবিংশ শতাব্দীরর প্রথমভাগে আমাদের দেশে নতন চিন্তাধারা আরম্ভ হয়। এই কাজে আগ্রনী ভূমিকা পালন করেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ মনীষীগণ। এই সকল মনীষী পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনাকে স্বদেশি ভাবনায় জারিত করে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের বীজ বপন করেছিলেন। তার অন্যতম উদাহরণ 'হিন্দুমেলা' প্রবর্তন। যদিও তা ছিলো ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত। ঠাকুর পরিবার এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই রকম বাতাবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়েছিলেন। তাঁর বহুমুখী চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল। একথা বললে বাহুল্য হবে না যে তিনি অন্যান্য শিক্ষা সংস্কারকগণের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাচর্চা বলতে বুঝতেন শিক্ষাকে বাঁধাধরা নিয়মকানুন না মেনে তাকে ব্যাপকতর করা, শুধু কেতাবি বিদ্যা দিয়ে মনের জড়তা দূর করা যায় না। উপনিষদ থেকেই তিনি এই শিক্ষা পেয়েছেন- 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তযে' অর্থাৎ সেই জিনিসই বিদ্যা যা আমাকে মক্তি দেয়।

শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর বোধ তৈরি হয়েছিল। তিনি চিন্তা করতেন শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, বোধের শিক্ষা, চরিত্র গঠনের শিক্ষা, নীতিবোধ ও ধর্মশিক্ষা, সৌন্দর্যবোধের জন্য শিক্ষা, শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা, সমাজে শিক্ষার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন কবির ধর্ম আর বিজ্ঞানীর ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল তেমন ঘটেছিল তাঁর সৌন্দর্যবোধ আর মঙ্গলবোধের মধ্যে। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এবং সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত।

প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের আর একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। ... আধুনিককালে শিক্ষা উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষাদান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপযুক্ত জায়গা হিসাবে শান্তিনিকেতনকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের জমিদার সিংহদের (লর্ড সিনহা নামে পরিচিত হয়) কাছ থেকে এই জমি গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে পৌষ উৎসবের সময় শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর (১৩০৮, ৮ই পৌষ) ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন করেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ সহ ছয় সাতজন ছাত্র নিয়ে এই বিদ্যালয়ের শুরু। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে পেয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর খৃষ্টান শিষ্য রেবাচাঁদকে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' উপাধি দিয়েছিলেন- যেটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পীড়িত ছিলেন। পরে আশ্রমের অধ্যাপনা ও সামাজিক কাজের জন্য যুক্ত করেন জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র রায়, মোহিত চন্দ্র সেন, নন্দলাল বসু, বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, প্রমুখ শিক্ষক, পণ্ডিত, শিল্পী ও সমাজসেবীদের।

আমাদের দেশের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, ভাষা পরিচ্ছদ, ধর্ম, লোকাচার ও উৎসবের যে পটভূমি ছিল তার উপর এই আশ্রমিক বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সাহিত্যপাঠ, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, অভিনয় করা, উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও সৌন্দর্য উপভোগ, পারিপার্শ্বিক গ্রাম পর্যবেক্ষণ হস্তশিল্প প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ক্লাস বসালেন খোলা আকাশে গাছের তলায়। বিদ্যালয়ে প্রথম প্রায় ১০ বছর রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন। নিজে অধ্যাপকদের বলতেন কীভাবে ভালো পড়ানো যায়। 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে লিখছেন, 'আমি পাঁচ ছয়টি ছেলে নিয়ে জামতলায় তাদের পড়াতাম। সেই ছেলে কয়টি নিয়ে রস দিয়ে ভাবদিয়ে রামায়ন মহাভারত পড়িয়েছি- তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।'

ক্লাসের পড়ার বাইরে জ্ঞানবৃদ্ধি ও চর্চার জন্য প্রবর্তন করেছিলেন নিয়মিত সাহিত্য সভা, দেওয়াল পত্রিকা, বিতর্কসভা প্রভৃতি। এ ছাড়া আনন্দচর্চার বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন-বিকেলে খেলাধূলা, সংগীতচর্চা, অংকনচর্চা, অভিনয় করা, নৃত্যচর্চা ইত্যাদি। এইভাবে সুস্থ রুচিবোধ আশ্রমের ছাত্রদের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল। সংগীত যে এই বিদ্যালয়ে কতখানি স্থান অধিকার করেছিল তা বুঝতে পারবো অজিত চক্রতীকে লেখা এই চিঠিতে - 'আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধহয় কমে এসেছে, সেটা ঠিক হবে না, ওটাকে জাগিয়ে রেখো আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহে ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে, তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। ...ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়।'

সংগীতচর্চার সঙ্গে চিত্রকলাকে সম্মানজনক বিদ্যা হিসেবে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ে। তৎকালীন যুগে বহু শিক্ষিত, পণ্ডিতগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত পাঠক্রমে যে দুটি বিষয়কে অন্যান্য বিষয়ের মতো সম্মানজনক স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এঁদের এই দ্বন্দ্ব বা সংস্কারকে দূর করতে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় 'কলাবিদ্যা' প্রবন্ধে লেখেন—'হৃদয়ের বৃত্তির দ্বারা মানুষ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।...এই হৃদয় বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থার এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নাই। স্থান থাকার গুরুতর প্রয়োজন আছে সেই বোধ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হইতে চলিয়া গিয়াছে। যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে জাতি কাজ করিতেও ভোলে। আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা নগণ্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের-মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। ইহাতে আমাদের প্রকৃত কর্ম শক্তিকেই দুর্বল করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকেও বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় বিদ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই নাচকে নটীবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করেন। উদয়শংকর এই ধারা অব্যাহত রাখেন।

এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি শান্তিনিকেতন শুধু পরীক্ষা পাস বা ডিগ্রি দেওয়াকে শিক্ষার একমাত্র মানদন্ড হিসেবে মূল্য দেয়নি। একজন মানুষের গুণচর্চাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে থাকাটাই একটা শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন একজন মানুষের কোনো গুণ নেই তা হয় না। মানুষের গুণটা খুঁজে বের করে তাকে লালন করা ও চর্চার সুযোগ দেওয়া হবে শিক্ষা আরেকটি উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁকে নানারকম নাটক, গান লিখতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্র শিক্ষানীতির মূলকথা' প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য...

'তিনিই (রবীন্দ্রনাথ) নাটের গুরু, ছেলে খ্যাপানো সর্দার, দলের ঠাকুর্দা, ছেলেমেয়েদের জন্য গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন, নাটক রচনা করেছেন, এই ছেলের দল চতুর্দিকে না থাকলে 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' কখনো লেখা হত না, অসংখ্য গানে প্রাণের আনন্দ এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হত না, এরা তাঁর সাহিত্যে অনেকখানি বৈচিত্র্য এনেছে, এই দিক থেকে ছাত্রশিক্ষক সকলেই এক বিরাট সৃষ্টিমূলক কাজের অংশীদার, শিক্ষাকে তিনি সৃষ্টিধর্মী কাজে পরিণত করেছিলন বলেই সেই কাজে এতখানি আনন্দের সঞ্চার করতে পেরেছেন।'

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত ছিল শিক্ষার অঙ্গ, কারণ এই গানগুলির মধ্যে আছে কোন সময় কোন ফুল ফোটে, কোন ঋতুতে কি জিনিস জন্মায় ইত্যাদি গানই যেন প্রকৃতি পরিচয়ের পাঠ। এছাড়া গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের মানুষদের জাতি, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা, ও আচারানুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা এবং তা লিপিবদ্ধ করবার মাধ্যমে অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ শেখানো হতো। অর্থাৎ বিদ্যাচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনচর্চার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী জীবনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়

ঘটানো। তিনি বিদ্যাচর্চা বলতে বুঝতেন গুণচর্চা; বিদ্বান নন অথচ গুণীমানুষ এমন অনেক ছাত্রছাত্রী তৈরি হয়েছে শান্তিনিকেতনে।

গান্ধীজি শিক্ষাদর্শের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাবলম্বী হওয়া। শ্রমকে তিনি শিক্ষায় বড় স্থান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাদর্শে সাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন, তবে গান্ধীজির শিক্ষা ব্যবস্থায় যতখানি কায়িক শ্রমকে কাজে লাগিয়েছিলেন ততখানি নয়।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের সময় সকল ছাত্রদের নিজের কাজ নিজের করতে হতো। সুতরাং এ কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কর্মভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার কিছু আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রয়োগ করেছিলেন শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠানে। সন্তোষচন্দ্র ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। পড়াশুনা থেকে হাতের কাজ, গৃহস্থালির কাজ ললিতকলা চর্চা, শরীকে কর্মঠ করবার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এই প্রতিষ্ঠানে।

আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলতে পারি রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ শুধু একজন মানুষের নান্দনিক দিকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো নয়, তার জীবিকা নির্বাহের পথগুলো নির্দেশ করে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ৮শিক্ষাদর্শে মানুষের জীবনকে, জীবিকার সমস্যাকে শিক্ষাদর্শ থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূলকথা জীবিকা থেকে জীবনের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন একজন মানুষ এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনবোধের গভীরতা বাড়াবে এবং সমাজকে শ্রীমণ্ডিত করবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষাবিভাগ ইউনেস্কো একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষাদর্শের পরিকল্পনা তৈরি করেছে জাক দ্যলর(Jacqu Dalar) এর নেতৃত্বে। কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন ড. করণ সিং। এই শিক্ষাদর্শের নাম– "Learning Treasure within"এর চারটি মূল উদ্দেশ্য থাকবে।

(১) Learning to know : জানতে শেখা

(২) Learning to do : কাজ করতে শেখা

(৩) Learning to be : বিকশিত হতে শেখা

(৮) Learning to live together : মিলেমিশে বাঁচতে শেখা।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্যের মধ্যে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের মূলভাবনা লুকিয়ে আছে।

প্রথম উদ্দেশ্য অর্থাৎ জানতে শেখা নিয়ে কিছু ভিন্নমত পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করতেন শুধু মুখস্ত নয় ছাত্রদের ধীগুণ বাড়াবার সুযোগ করে দিতে হয়। শিক্ষার্থী শুধু প্রশ্নের উত্তর দেবে তা নয়, সে প্রশ্ন করতে শিখবে। এই প্রসঙ্গে এক স্প্যানিশ ভদ্রলোকের কথা উল্লেখকরি, নাম- হোসে পাস্ রোদ্রিগেস্, ভিগো বিশ্ববিদ্যালয় ও সেগনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (UNED) শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ের অধ্যাপক। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে গবেষণা রত, তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং আজও তাঁর শিক্ষাভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

কার্ল মার্কস : অর্থনীতি ও বর্তমান সময়

সুবীর মুখোপাধ্যায়

আজকের দুনিয়ায় বেসরকারি লগ্নিপুজি এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এই বেসরকারি পুঁজির রমরমা তার মধ্যে রয়েছে ভোগ্যপন্ন ও সফটওয়্যার শিল্প। এই পুঁজি কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে না শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও উষ্ণায়ন প্রতিরোধের মতো ক্ষেত্রে। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতাকে সুস্থায়ী করে রাখতে হলে যেসব ক্ষেত্রে গুরুত্ব অপরিসীম সেখানে বেসরকারি পুঁজির ভূমিকা নেই বললেই চলে। তাৎক্ষণিক মুনাফার আশা এই বিনিয়োগের মূল চালিকা শক্তি।

এই ধরনের ঘটনা যে মাত্রা নিয়েছে তা আগে ছিল কিনা সন্দেহ। তবুও ইউরোপের শিল্প উন্নয়নের অবস্থা দেখে কার্ল মার্কস (মে ৫, ১৮১৮- মার্চ ১৪, ১৮৮৩)ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস(নভেম্বর ২৮, ১৮২০- অগাস্ট ৫, ১৮৯৫) অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে যে দার্শনিক তত্ত্ব ও কর্মসূচি উপস্থিত করেছিলেন তার প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই বইতে রাষ্ট্র সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায় কমিউনিস্টদের লক্ষ্য সম্পর্কে ।এমনই একটি সমাজ গঠন করা যেখানে সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি সদস্যর থাকবে নিজের ক্ষমতার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকাশের । আর এই জন্যই প্রয়োজন হয় ব্যক্তি সম্পত্তির বিলোপ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার।

এই সবেরই একটি ফলিত রূপ আমরা দেখতে পাই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর। রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনীকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য গোটা পৃথিবীর সামনে মার্কসীয় মতাদর্শকে এক উচ্চ মাত্রায় প্রতিষ্ঠায় এনে দেয়। ১৯৪৫ এর পর পূর্ব ইউরোপ সহ চীন,ভিয়েতনাম, কিউবা তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছতে থাকে মার্কসের তত্ত্ব ভাবনা এবং তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ দেখা যায় প্রায় সর্বত্র। কিন্তু ১৯৯০- ৯১ সালে এসে সোভিয়েত ব্যবস্থার পতন সারা বিশ্বের সামনে মার্কসীয় তত্ত্বের উপর বিরুদ্ধ মতামত প্রবল আকারে চেপে বসে। উঠে আসে নানা প্রশ্ন।যদিও এই প্রশ্ন যে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে উঠেছে তা কিন্তু নয় , মার্কস তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্ন এর আগে উঠেছে এবং এ নিয়ে নিরন্তর আলোচনা চলেছে। সেই আলোচনা আজও থেমে নেই। এটাই মার্কস তত্ত্বের বিশেষত্ব বলে অনেকেই বলছেন।মার্কস চর্চা আজ সারাবিশ্বে একটি চলমান বিষয়।

মার্কসের তত্ত্বে মূল্য তত্ত্ব একটি মৌলিক ধারণা অথচ এই মৌলিক ধারণা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু আজ নতুন নয়। তার সূত্রপাত ঘটেছে মার্কসের সময়েই। আসলে মার্কসের মূল্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে মূল আক্রমণটি শাণিত হয়েছে তাঁর মূল্যের শ্রম তত্ত্বের বিরুদ্ধে। মার্কস তার মূল কথাগুলি বলেছেন পুঁজি গ্রন্থে সেখানেই তিনি মূল্যের ধারণা এবং তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে রেখেছেন। সেই আলোচনা এখানে করছিনা।

বর্তমানে আমরা অর্থনীতি বলে যাকে উল্লেখ করতে চাই তাহলে পলিটিকাল ইকোনমি,যার প্রধান প্রবক্তা অ্যাডাম স্মিথ (১৭২০-১৭৯০)। এখানে সমাজের প্রার্থীব ধন-সম্পদের বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে অ্যাডাম স্মিথের হাতে যে পলিটিকাল ইকোনমির সূত্রপাত সেখানেই রয়েছে মূল্য তত্ত্বের একটি বড় ভূমিকা। মূল্যের ধারণার সঙ্গে উৎপাদনের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আর আধুনিক সমাজে উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময় প্রক্রিয়াও ওতোপ্রতো ভাবে সংযুক্ত। সমাজে শ্রমবিভাজন যত এগোবে বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা তত বেশি করে দেখা দেবে। আর তাই গুণগতভাবে পৃথক দুটি পণ্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে তার ন্যায্যতা বা সমতা নিয়েও প্রশ্ন থাকবে।

মার্কস পুঁজি তন্ত্র বা সমাজ ইতিহাসের যেকোনো পর্বকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন পার্থক্য সেখানেই। মার্কস সমাজের পরিবর্তনশীলতার বিষয়টিকেই গুরুত্ব সহকারে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করার সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে তা কিভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তমূল্যকে ব্যবহার করছে সেটাই দেখতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অতি শোষণএর মাধ্যমে অতি মুনাফার বৃদ্ধি আজ সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি পশ্চাদপদ দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার চলন, শ্রেণীবিন্যাস, সাংস্কৃতিক মান, ইত্যাদি সবকিছুই নিজেদের মর্জি মতো পরিবর্তন করে চলেছে। এই পুঁজির স্থানান্তর ঘটছে একদল পুঁজির অধিকারী বা কর্পোরেট হাউজের মাধ্যমে।এই মানুষগুলি শ্রমিকদের ঠকাতে পারলেও তারা দাস বনে যাচ্ছে পুঁজির কাছে। বর্তমানে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে মুনাফার হার কে ঊর্ধ্বগতিতে নিয়ে যেতে যা সাহায্য করেছে তা হল প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি।

বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রযুক্তির উদ্ভাবন এক বিশেষ গতি পেয়েছে। ফলে যে কোন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবিক শ্রম যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে, ফলে মজুরির খরচ কমেছে, বেড়েছে মুনাফার হার। এই যাত্রাপথেই আমরা পেয়েছি ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই পরিবর্তনের মাত্রা এতই দ্রুত যে এতে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই ও কর্মসংস্থান কমে আসছে। এই প্রযুক্তি যেমন কায়িক শ্রমকে লাঘব করেছে তেমনি মানসিক শ্রমকেও কমিয়ে এনেছে। বর্তমানে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা শুধু পরিষেবা ক্ষেত্র নয়, তা কৃষি থেকে ম্যানুফাকচারিং পরিষেবা থেকে তথ্যপ্রযুক্তি সবকিছুই আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধীন।

এই পর্যায়ে এসে আমরা মার্কসীয় অর্থনীতির অতি সামান্য কয়েকটি মৌলিক ধারণার উল্লেখ করব মাত্র। মার্কসের মতে– কোন পণ্যের মূল্যের পরিমাপ হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় যা আবার প্রকাশিত হয় অর্থ মূল্যে। পন্য মূল্য নির্ধারণে নিয়োজিত শ্রম - সময় বিদ্যমান গড় প্রযুক্তিগত অবস্থার অধীনে পণ্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। পণ্যমূল্যের পরিমাপ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। আর এক্ষেত্রে মার্কসের মতে যে তিনটি তিনটি মৌল উপাদান প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে তা হল - স্থির পুঁজি,পরিবর্তনশীল পুঁজি এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হল পণ্য মূল্যের বাড়তি উৎপাদন।

এখানে এসে এই শতকের অন্যতম শিল্প তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অবস্থা একটু বুঝে নিতে হবে। দেখা যাচ্ছে এই শিল্প মুনাফার শিখর স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর অবনতির পথ দেখছে। আর তাই ২০২২ সালের পর থেকে এই শিল্পে শুরু হয়েছে ব্যাপক কর্মসংকোচন।অর্থাৎ বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে মন্দা ও মুনাফার গতি নিম্নমুখী হওয়াটা পুঁজির সংকট ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন হল পুজি তন্ত্রের কাছে কি এই অবস্থার নিরাময় সূত্র রয়েছে? এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তাদের কাছে অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথ। আর বর্তমান বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেই দিকেই হাঁটছে। এর সঙ্গে সাথ দিচ্ছে এ আই প্রযুক্তি। তাই অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রেই। সুতরাং যুদ্ধ, ইউক্রেন থেকে শুরু করে বর্তমানে ইরানের উপর যুদ্ধ এই প্রক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে ভারতে যেখানে পুজিবাদী উৎপাদনের আধিপত্যের পাশাপাশি আরো ও অন্যান্য উপাদানের বিভিন্ন সম্পর্ক একই সাথে অবস্থান করে এবং এখানে যেহেতু মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে, তাই এখানে উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি অর্থনীতির সেই সব খাতে সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে পুঁজি নিবেশ অত্যন্ত নিবিড় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বিস্তার ঘটবে অনেক ধীরে।

কার্ল মার্কস তার সময়ের ইংল্যান্ডের যে পুঁজির চেহারা দেখেছিলেন সেখান থেকে তিনি তার পুঁজি গ্রন্থে ধনতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি নিজেই তার জীবদ্দশায় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই বিভিন্নভাবে মার্কসের বহুমাত্রিক ভাবনাকে একমাত্রিকতার ছাচে ভরে দেওয়ার এক প্রচেষ্টা। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ভাবনা উপস্থাপন বর্তমানে এসে করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে। আর তাই ফিনান্স পুঁজির প্রকৃতি, গ্লোবাল ভ্যালু চেন, নতুন শ্রম কোড, দারিদ্র্য এবং কৃষি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি - মার্কস প্রদর্শিত পথে আরো বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

‘ভোটব্যাঙ্ক’-এর মিথ এবার তছনছ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান

মিলন দত্ত

গত বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২০২৬ সালে সবনিম্ন মুসলমান প্রতিনিধিত্ব; মাত্র ৩৮ জন। তাও আবার চারটি দল মিলিয়ে। ২৯৪ জনের বিধানসভায় ২০০৬ সালে মুসলিম বিধায়ক ছিলেন ৪৬ জন। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯। ২০১৬ সালে অবশ্য ওই সংখ্যা তিনটে কমে হয় ৫৬। ২০২১ সালে সেই সংখ্যা কমে হয় ৪২। কারণ বিজেপিতে কোনও মুসলমান বিধায়ক ছিল না। ২০২৬-র বিধানসভাতেও বিজেপির ২০৮ জন বিধায়কের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই। ২০২১,এ মুসলমান ভোটের মেরুকরণের পুরো ফসল তুলেছিল তৃণমূল। এ বারে ভোটে তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব হিসেব তাই গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

মেনেই নেওয়া হয়, মুসলমানরা আসলে ‘ভোটব্যাঙ্ক’। সাধারণভাবে এই অপবাদ মুসলমানের প্রাপ্য নয়। কিন্তু মুসলমানদের ভেতর থেকেও নিজ সম্প্রদায়কে ‘ভোটব্যাঙ্ক’ বা ‘ভোটব্লক’ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। মুসলমানকে ভোটব্যাঙ্ক ভাবার মধ্যে ওই সমাজ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণাও কাজ করে। অ-মুসলমানরা মনে করেন, মুসলমান হল মোল্লা-মৌলবি শাসিত ধর্ম নিয়ন্ত্রিত একটি সমাজ। এমনই একটি ধারণা থেকে সে মনে করে, মুসলমান মসজিদের ইমামের কথায় চলে। ভোটও দেয় ইমামের নির্দেশে। সবৈব মিথ্যা এই ধারণা শিক্ষিত হিন্দুদের সামষ্ঠির মানসিকতার অংশ; তাকে দূর করা যাবে কিভাবে? কিন্তু এ বারের নির্বাচনে বিশেষত বাঙালি মুসলমান ‘ভোটব্যাঙ্ক’-এর মিথ্যা ধারনাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। তা ভোটের ফলাফলেই প্রমাণিত।

২০১১,র শেষ সেন্সাস অনুযায়ী রাজ্যে অন্তত ২৫ শতাংশ মুসলমান আছে এমন বিধানসভার সংখ্যা ১৪৬। ২০২১,এর বিধানসভা ভোটে এর মধ্যে তৃণমূল ১৩১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। বিজেপি পায় মাত্র ১৪টি আসন। বাম,কংগ্রেস,আইএসএফ জোট একমাত্র ভাঙড়ে জয়ী হয়েছিল। ২০১৬,র ভোটেও রাজ্যের এই মুসলমান বলয়ে তৃণমূল ৯৬টি আসনে জয়ী হয়েছিল। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে তৃণমূলের এই ভোটব্যাঙ্ক এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে আড়াআড়ি ভাবে টুকরো হয়ে গিয়েছে। মোট যে ৩৮ জন মুসলমান বিধায়ক এবার বিধানসভায় বসবেন, তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের ৮১ জনের ৩১জনই মুসলমান। কংগ্রেস ২, সিপিএম ১, আইএসএফ ১ এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২টি আসনে জয়ী হয়েছে; সবকটিতেই জয়ী প্রার্থী মুসলমান।

উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের মুসলমান অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলোতে কী ভাবে বিজেপি আসন জিতেছে, কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটচিত্র দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদের বড়ঞাঁ কেন্দ্রে ৪০ শতাংশের বেশি মুসলমান ভোট রয়েছে। কিন্তু সেখানে বিজেপির সুখেন বাগদি ৪৮ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা রজক পেয়েছেন প্রায় ৩৭ শতাংশ ভোট। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫০ শতাংশ মুসলিম ভোটার থাকা সত্ত্বেও বিজেপির বিরাজ বিশ্বাস জয়ী হয়েছেন। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী প্রায় ৩৫ শতাংশ এবং সিপিএম ১৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২০২১,এ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের যে একাধিপত্য ছিল এবার সেই মুসলমান ভোট তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম, আইএসএফ, হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি,র মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। তবে মুসলমান ভোট কতটা তাঁদের দিয়ে গিয়েছে সে ব্যাপারে বিজেপি নেতারা এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নন। অনেকেই মনে করছেন, তৃণমূলের মুসলমান নেতাদের গা জোয়ারির কারণে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু কিছু বিধানসভা

কেন্দ্রে মুসলিম সমর্থন বিজেপির দিকে গিয়েছে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যেহেতু এখনও কাউন্টিংয়ে অনিয়মের তত্ত্বে অনড় রয়েছেন, তাই এই বিষয়ে তাঁদের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

সরকারি টাকা খরচ করে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির, শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির, নিউটাউনে দুর্গাঙ্গণ নির্মাণের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি হিন্দু-মুখী উদ্যোগ রাজ্যের মুসলমানদের একাংশকে সরকারের দিক থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এই সব কিছুর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারের প্রতি যে তীব্র একটা বিরূপতা তৈরি হল তার খবরও রাখেননি আমাদের বাঘা সংবাদ মাধ্যম বা ভোট-কুশলী বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা নানাবিধ আন্দাজ করেছেন মুসলমান ভোট নিয়ে; তার কোনওটাই মেলেনি। হিন্দু এবং আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলায় শূন্য হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। এসএইআরের সব হিসেব উল্টে দিয়ে প্রভাব পড়েছে মতুয়া বলয়েও। কলকাতায় হিন্দু এবং হিন্দু উদ্বাস্তু প্রভাবিত জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, ভবানীপুরে বিজেপি জয়ী হয়েছে। কলকাতা বন্দর, চৌরঙ্গি কেন্দ্রে মুসলমানরা এককাট্টা থাকায় ফিরহাদ হাকিম, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হলেও তা এখন নেহাতই ব্যতিক্রম।

এ বারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের একেবারে কেন্দ্রে ছিল মুসলিম রাজনীতি। বিজেপির ক্রমাগত প্রচার ছিল, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে রাজ্যের জনসংখ্যার চরিত্র বদলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে। তাছাড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা রকমের বিষোদ্গার করেছেন দিলীপ ঘোষ এবং অধুনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ উস্কে দেওয়ার পিছনে বিজেপির অন্যতম প্রধান অভিযোগ ছিল, তৃণমূল অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে। তৃণমূলের তোষণের রাজনীতির ফলেই মুসলিমদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। আর তৃণমূল এসআইআর, এনসিআর এবং সিএএ-এর জুজু দেখিয়ে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাজ হয়নি।

এ রাজ্যের মুসলমান সেই সত্তরের দশক থেকেই 'মুসলমান দল' ত্যাগ করে মূলধারার রাজনীতিতেই আস্থা রেখেছে। কিন্তু এবার এসআইআর-এর চক্করে পড়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মুসলমান ভোটারদের অনেকেই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তাঁদের পরিবার এবং স্বজনেরা অনেক ক্ষেত্রেই এমন কাউকে ভোট দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন যাঁরা তথাকথিত মুসলমান কৌমের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে ভোট চেয়েছেন। হুমায়ুন কবীরের জোড়া আসনে জয় অনেকটা তারই প্রমাণ। অনেকেই মনে করেন, মুসলিম ভোটের মেরুকরণের অর্থই হল হিন্দু ভোটেরও মেরুকরণ। এমনিতেই বিজেপির কৌশল হল, কংগ্রেস, তৃণমূল বা সিপিএমের মতো দলগুলোর গায়ে 'মুসলমানের পার্টি'র তকমা সেঁটে দেওয়া। এবারের নির্বাচনী ফলাফল বিজেপিকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে।

কেবল বাংলায় নয়, দেশের সব কটি রাজ্যের বিধানসভা ফলাফল নিয়ে বিজেপি-আরএসএস সেই প্রচার শুরু করেছে। তারা বলছে, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের তিন ভাগের এক ভাগ বিধায়কই মুসলিম। কংগ্রেসের দু'জন বিধায়কই মুসলিম। সিপিএমের একজন বিধায়ক, সেও মুসলিম। আইএসএফের একমাত্র বিধায়কও মুসলমান।

তবে এই সমীকরণ হিন্দিভাষী মুসলমান অধ্যুষিত বিধানসভাগুলিতে কাজ করেনি। মেটিয়াবুরুজ থেকে বালিগঞ্জ সংখ্যালঘু ভোট ৫০ শতাংশের বেশি না হলেও জোড়াফুল সেখানে জয়ী হয়েছে। কারণ, এই বিধানসভাগুলিতে মুসলমান ভোটাররা বরাবরের মতো একচেটিয়া ভাবে তৃণমূলকেই সমর্থন করেছেন। কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ২৫ শতাংশ মুসলমান ভোট। সেখানেও মুসলমানদের বড় অংশ হিন্দিভাষী। সেই জনতার সমর্থন এককাট্টা থাকায় জাভেদ খান জয়ী হয়েছেন। কসবায় বিজেপি ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেলেও জাভেদ পেয়েছেন ৪৮ শতাংশ ভোট। সিপিএম প্রার্থী দীপু দাস ৮ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন ওই কেন্দ্রে। মুসলমান ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণের কারণে কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে ফিরহাদ হাকিম ৬৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন। ওই বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলমান ভোট প্রায় ৪৩ শতাংশ। তবে ওই কেন্দ্রে হিন্দু ভোটেরও উল্লেখযোগ্য অংশ কলকাতার মেয়র পেয়েছেন। সেখানে সিপিএম এবং কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট মাত্র দেড় শতাংশের সামান্য বেশি। বিজেপি-র অনেকেই স্বীকার করছেন, হিন্দিভাষী মুসলমান ভোটের ৯৯.৯৯ শতাংশ তৃণমূল পেয়েছে। কাশীপুর,বেলগাছিয়া কেন্দ্রে সেটাই হয়েছে। অহিন্দিভাষী মুসলমান ভোটেরও বড় একটা অংশ তৃণমূল পেয়েছে। কিছু কেন্দ্রে কংগ্রেস, সিপিএম এবং আইএসএফ পেয়েছে।

জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট। তবে হিন্দু ভোটের বিপুল মেরুকরণ হওয়ায় তৃণমূল ওই কেন্দ্রে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছে। ওই কেন্দ্রে হিন্দিভাষী মুসলমানদের ভোটের কিছু অংশ বাম,কংগ্রেসের দিকে গিয়েছে বলে তৃণমূলের নেতাদের মনে হচ্ছে। এই কাটাকাটি না হলে জোড়াসাঁকো আসনটাও হয়তো তৃণমূল পেত। বৃহত্তর কলকাতার বাইরে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, ইটাহার, হেমতাবাদ, করণদিঘি বিধানসভাতেও ৫০ শতাংশের বেশি

মুসলমান ভোট রয়েছে। তাদের বড় অংশই হিন্দিভাষী মুসলিম। কিন্তু করণদিঘি ও হেমতাবাদ কেন্দ্রে হিন্দিভাষী সংখ্যালঘু ভোট এককাট্টা থাকেনি। চোপড়া, ইসলামপুর, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর, ইটাহারে মোটের উপরে সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলমুখী হওয়ায় এই পাঁচ কেন্দ্রে বিজেপি কিছু করে উঠতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের এই ফলাফলের পরে বোঝা গেছে গ্রাম শহর নির্বিশেষে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ হয়েছে। 'ভোটব্যাঙ্ক' নামক একশিলা (মোনোলিথ) সমাজের যে বদনাম এতদিন মুসলমানদের দেওয়া হত, আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা সেই মোনোলিথ সমাজের দাবিদার হয়ে উঠেছে। তারা একচেটিয়াভাবে হিন্দুত্বকে গুরুত্ব দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিজেপির দিকে ঢলে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথায় কথায় 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির কথা বলে থাকেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনও ধর্মীয় বৈষম্য হয় না। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকেন। আমরা আশা করতেই পারি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নতুন সরকার তাদের যাবতীয় সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করবে না। নরেন্দ্র মোদী যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তার সুফল মুসলমানদের কাছেও সমান ভাবে পৌঁছবে। রাজ্যে বিজেপি জয়ী হওয়ার পর থেকে সাধারণ মুসলমান ভীতির মধ্যে আছে। তারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। এই ভয় থেকে তাদের বের করে স্বাভাবিক করে তোলার দায়িত্ব সরকারের; যে সরকার মুখে 'সবকা সাথ'-এর কথা আউড়ে যাচ্ছে সর্বক্ষণ। সেটা তো কাজেও করে দেখাতে হবে !

মসনদ থেকে মমতার বিদায়, সিংহাসনে শুভেন্দু

মজিবুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জির ইনিংস শেষ হয়েছে। নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইনিংস শুরু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ১৯৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্ট একটানা সাতবার এবং টিএমসি পরপর তিনবার সরকার গঠন করে। পশ্চিমবঙ্গের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, কোনো ফ্রন্ট বা দল ক্ষমতাচ্যুত হলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না। সেই হিসেবে বড় বিতর্কমূলক কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী এক-দেড় দশক রাজ্যের শাসনক্ষমতায় থাকতে চলেছে বিজেপি।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যে একজন ব্যক্তি একটানা পনেরো বছরের বেশি মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন অথবা একটি দল পরপর চারবার সরকার গঠন করেছে এমন দৃষ্টান্ত বেশি নেই। সেই দিক থেকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন টিএমসি'র পরাজয় একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তবে বার্ধক্যজনিত কারণে কারোর প্রয়াণ ঘটলেও যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করতে চায় তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণতিরও কারণ অনুসন্ধান করা হয়। ২০২৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। একটা হলো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা (অ্যান্টি ইনকামবেন্সি)। কোনো দল যখন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের কাজকর্ম মানুষকে আর আকর্ষণ করতে পারে না বরং একঘেয়ে লাগে। মানুষ স্বাদ বদল করতে চায়। অন্য দলকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়। টিএমসি'র বিদায় ও বিজেপি'র আগমনের মধ্য দিয়ে এটাই ঘটেছে।

মানুষ এই নির্বাচনে টিএমসি'র নেতামন্ত্রীদের বেলাগাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। দুর্নীতির জেরে আদালতের রায়ে গত বছর ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল হয়। সরকার চেষ্টা করলে ১৭-১৮ হাজার বৈধ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি টিকে যেত। বারবার বলা সত্ত্বেও বৈধ-অবৈধ পৃথকীকরণ করা হয়নি। শাসকদলকে চাকরিচ্যুতদের অভিশাপ লেগেছে। শিক্ষা সহ সকল দপ্তরেই বহু পদ শূন্য রয়েছে। কম বেতনের অস্থায়ী কর্মী দিয়ে কাজ তোলা হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ বেতন কাঠামোর স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। যুবসাথীর মতো ভাতা কর্মসংস্থানের সহজাত দাবিকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। তাই চাকরি প্রত্যাশীরা টিএমসি সরকারের প্রত্যাবর্তন চাইনি। মহার্ঘ ভাতা প্রদানে মমতা ব্যানার্জির সরকারের চরম অনীহায় চাকরিজীবীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। পোস্টাল ব্যালটে এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বালি, কয়লা, গরু, রেশন, চাকরির মতো কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির পাশাপাশি টোটোওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, চাওয়ালা, রাস্তার ধারে ফল বিক্রেতা প্রভৃতি দরিদ্র মানুষদের কাছ থেকেও টিএমসি'র লোকজনেরা তোলা আদায় করত। পঞ্চায়েত অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি ও অনুদানপ্রাপ্তি কোনোটাই মেম্বার-প্রধানরা উৎকোচ ছাড়া করেন না। শহরে জায়গা কেনা থেকে বাড়ি তৈরির মালপত্র কেনা সবেতেই চলছিল সিন্ডিকেটরাজ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লরি থেকে সিভিক পুলিশের তোলা আদায় অত্যন্ত পরিচিত একটি দৃশ্য ছিল। সরকারি অফিসগুলোতে ঘুষের পরিমাণ বাড়ছিল। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সবার কাছেই পরিস্থিতি বিরক্তি হয়ে পরিবর্তন চাইছিল।

বিভিন্ন অনুদান প্রদানকারী প্রকল্প ছিল মমতা ব্যানার্জির জনসমর্থনের একটি বড় হাতিয়ার। টিএমসি'র হাতিয়ারটিকে বিজেপি এই নির্বাচনে অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার করেছে। বিজেপি'র জাতীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় এই প্রকল্পগুলো বন্ধ করার বদলে বারবার অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলেছে। কাজেই উপভোক্তারা টিএমসি'র পরাজয়ে প্রকল্প বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করেনি বরং বেশি টাকা পাওয়ার প্রত্যাশায় বিজেপি'কে ভোট দিয়েছে।

টিএমসি'র অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের পরাজয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। টিএমসি'র সর্বস্তরের নেতাকর্মী মমতা ব্যানার্জিকে অন্তর থেকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। 'দিদি'র দিকে চেয়েই অধিকাংশ মানুষ দলটা করে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জির ব্যবহার ও ঠাটবাট নিয়ে অনেকেই অসন্তুষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূলত তাঁর সঙ্গে বিরোধের কারণেই মুকুল রায় ও শুভেন্দু অধিকারী টিএমসি ছেড়েছিলেন। তিনি দলের সংগঠনে যে 'কর্পোরেট কালচার' চালু করেছেন তা দলের প্রতি নেতাকর্মীদের আবেগে আঘাত করেছে। নেতাকর্মীদের মধ্যে মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক সৃষ্টি করে কোনো রাজনৈতিক দল বেশিদিন টিকতে পারে না।

পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক টিএমসি'র ভরাডুবিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। অভিষেক আই-প্যাক দেখতেন। অভিষেকের সমর্থন ও প্রশ্রয়ে সংস্থাটি দল ও প্রশাসনে রীতিমতো দাদাগিরি চালাত। সম্পূর্ণ বেসরকারি সংস্থা হয়েও এরা আধিকারিকদের পোস্টিং ঠিক করত। দলীয় পর্যায়ে কে কোন পদে থাকবে তা স্থির করত। নির্বাচনে টিকিট বন্টন করত। আর, এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে এসব করা হত অর্থের বিনিময়ে। একটা দলীয় পদ বা নির্বাচনী টিকিটের জন্য একাধিক জনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হত। অনেকেই প্রতিশ্রুত পদ বা টিকিট পেতেন না, টাকাও ফেরত পেতেন না। আই-প্যাক কার্যত একটা তোলাবাজি সংস্থায় পরিণত হয়েছিল।এভাবেই এতদিন চলছিল। এবারের নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সিটিং এমএলএ-কে নমিনেশন দেওয়া হয়নি। এঁরা অনেকেই ভেতরে ভেতরে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট করেছেন।

এসআইআর টিএমসি'র সর্বনাশ করেছে। প্রক্রিয়াটি খসড়া তালিকা প্রকাশ পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে ষড়যন্ত্র করে লাখ লাখ মুসলমানের নাম বাদ দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীর সংখ্যা চৌত্রিশ লাখ। দু-চারশো বাদ দিয়ে এরা সবাই বৈধ ভোটার যারা এই নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারল না। বঞ্চিত ভোটারদের তিন-চতুর্থাংশই বিজেপি'র বিরুদ্ধে ভোট দিত বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি ও টিএমসি'র প্রাপ্ত ভোটের ফারাক বত্রিশ লাখ, যা বঞ্চিত ভোটারের সংখ্যা থেকে কম। কাজেই লাখ লাখ মানুষের ভোটাধিকার হরণের ঘটনা টিএমসি'র গুরুতর ক্ষতি তথা বিজেপি'র সাঙ্ঘাতিক লাভের কারণ হয়েছে।

মমতা ব্যানার্জি ক্রমশ মুসলিম সমাজের আস্থা ও ভরসা হারাচ্ছিলেন যা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি বিজেপি'র জুজু দেখিয়ে মুসলিমদের 'গ্যারান্টেড' ধরে নিয়েছিলেন। মমতার মুসলিম তোষণ নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও মুসলিমদের প্রকৃত উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি আন্তরিক নন বলে অনেকেই মনে করেন। ওয়াকফ, এসআইআর, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূমিকায় মুসলিম সমাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে। এই নির্বাচনে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন টিএমসি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করেছে। ২০২১ সালের নির্বাচনের তুলনায় প্রায় পাঁচ শতাংশ মুসলিম ভোট টিএমসি থেকে সরে গেছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তত পনেরোটি আসনে আইএসএফ, এজেইউপি অথবা মিম প্রভৃতি মুসলিম দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বিজেপি'র কাছে টিএমসি'র পরাজয়ের ব্যবধানের থেকে বেশি। সিপিআইএম, কংগ্রেস, আইএসএফ ও এজেইউপি মুসলমান অধ্যুষিত যে ছয়টি আসনে জিতেছে সেগুলোর পাঁচটিই ছিল টিএমসি'র দখলে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর লাগাতার উগ্রহিন্দুত্ববাদী কথাবার্তা হিন্দু ভোটের একত্রীকরণে (কনসোলিডেশন) সহায়ক হয়েছে। তিনি বারবার মুসলমানদের ভোটের প্রয়োজন নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। হুমায়ুন কবীরের মতো কিছু মুসলিম নেতার আপত্তিকর মন্তব্য, বাংলায় বাবরি মসজিদ নির্মাণ এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হিন্দুত্ববাদীদের প্ররোচনা জুগিয়েছে। অমিত শাহ-শুভেন্দু অধিকারীরা রোহিঙ্গা, জেহাদি, বাংলাদেশী, ঘুসপেটিয়া, অনুপ্রবেশকারী প্রভৃতি তকমা দিয়ে এরাজ্যের মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের মধ্যে একটা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্দেহের ভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। মুসলমানদের মেসিহা 'মমতাজ বেগম'কে ক্ষমতাচ্যুত করতে 'সনাতনী'রা এককাট্টা হয়েছে। টিএমসি থেকে প্রায় পাঁচ শতাংশ হিন্দু ভোট বিজেপি'র দিকে সুইং করেছে। বাম-কংগ্রেস থেকেও অন্তত দুই শতাংশ হিন্দু ভোট বিজেপি'র দিকে গেছে। কিন্তু টিএমসি'র থেকে মুসলিম ভোট পেয়ে বাম-কংগ্রেসের ভোট পার্সেন্টেজ একই থেকে গেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার বিজেপির আট শতাংশ (৪৬-৩৮) ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, টিএমসি'র সাত শতাংশ (৪৮-৪১) কমেছে। অর্থাৎ,

বিজেপি টিএমসি থেকে পাঁচ শতাংশ (৪৬-৪১) ভোট বেশি পেয়েছে। ২০২১ সালে টিএমসি বিজেপি'র চেয়ে দশ শতাংশ তথা ষাট লাখ ভোট ও ১৩৯টি (২১৬-৭৭) আসন বেশি পেয়েছিল। ২০২৬ সালে বিজেপি টিএমসি'র থেকে পাঁচ শতাংশ তথা ৩২ লাখ ভোট ও ১২৭টি (২০৭-৮০) আসন বেশি পেয়েছে।

এবারের নির্বাচনে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে হয়েছে। কিন্তু ভোটগণনার ক্ষেত্রে একথা বলা যাচ্ছে না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটগণনায় শাসকদল টিএমসি ব্যাপক কারচুপি করেছিল। বিডিও অফিসের লোকজন ওই দুষ্কর্মে যুক্ত হয়েছিল। এবার বিজেপি কিছু কেন্দ্রে এই অপকর্মটি করেছে। নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি'র পক্ষে কাজ করেছে।

বাংলার মসনদ থেকে মমতা ব্যানার্জি বিদায় নিয়েছেন। ভবানীপুরে নিজের আসনটিও রক্ষা করতে পারেননি। ৮০টি আসন ও ৪১ শতাংশ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও অনেকেই মনে করছেন তাঁর দল টিএমসি'র ঘুরে দাঁড়ানো খুব কঠিন। শুভেন্দু অধিকারী সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে প্রতিটি চ্যালেঞ্জে তিনি জয়ী হয়েছেন। 'পিসি'কে প্রাক্তন করে দিয়েছেন।

বাংলায় বিজেপি সরকার : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

সুকুমার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে (২৯৩ আসনে নির্বাচন হয়েছে, ফলতায় ২১ মে হবে) বিজেপি ২০৭ আসনে জয়লাভ করে ১৫ বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি- মানুষ সরকারের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ৮০ টি আসন । বিজেপি' র প্রাপ্ত ভোট ৪৫.৮৪ শতাংশ। ২০২১-এর ৭৭ আসন থেকে লাফ; নির্বাচন কমিশনের ভোটাধিকার হরণ , রাজ্য সরকারের দুর্নীতির ফলে অসন্তোষ , প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অসংখ্য মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যের দলীয় মুখ্যমন্ত্রীদের লাগাতার প্রচার ও ধর্মীয় মেরুকরণের জন্য ব্যাপক প্রোপাগান্ডা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের লাগাতার প্রচার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে, সাংগঠনিক দুর্বলতা, তৃণমূলের মহিলা ভোটভিত্তি এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে । রাজ্যে সাম্প্রতিক এই পরিবর্তন শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।

২০২৬ নির্বাচন দুই দফায় (২৩ ও ২৯ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিজেপি ৪৫.৮৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূলের ৪০.৮০ শতাংশ ছাপিয়ে গেছে। কংগ্রেস পেয়েছে প্রায় ৩ শতাংশ ভোট। বামেদের মোট প্রাপ্ত ভোটের হার ৫.০৬ শতাংশ। ২০২১-এ ৭৭ আসন থেকে বিজেপির কাছে এই লাফ এসেছে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সক্রিয়তা, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং স্থানীয় অসন্তোষের সমন্বয়ে। বিশেষ করে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির অগ্রগতি ভোটারদের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। তবে বিজেপি বিরোধী প্রগতিশীল ও বামদলগুলি জোট না হয়ে আসন সমঝোতা হলে বিজেপির থেকে বিরোধীদের ভোটের ব্যবধান ১০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যা বিরোধীদের অবিমৃশ্যকারিতা বা সহনশীলতার অভাবের জন্য সম্ভবপর হয়নি।

তৃণমূল ৮০ আসনে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যখন কংগ্রেস, সিপিএমসহ অন্যান্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোনও রকমে বিধানসভায় এবার খাতা খুলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে গণনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এছাড়া ৩৪ লক্ষাধিক বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গিয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের ব্যবধান ৩০ লক্ষ। ফলে ভোটের এই ফলাফল বাংলার 'তৃণমূল-বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ' চক্র ভেঙে বিজেপিকে প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিজেপির শাসনকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির মাধ্যমে বাংলায় বিনিয়োগ আকর্ষণ, পর্যটন উন্নয়ন এবং শিল্প স্থাপত্যের গতি বাড়ানো সম্ভব। বিজেপির নেতৃত্বে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের সুবিধা নিয়ে ভোটারদের একাংশ প্রত্যাশিত ছিলেন, যা এখন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ। বিজেপির সংকল্প পত্র সামনে রেখে আগামি দিনে কতটা পথ চলতে পারে তার উপর নির্ভর করছে সরকারের স্থায়িত্ব।

সাংস্কৃতিকভাবে, বিজেপি বাংলার হিন্দুত্ববাদী ভিত্তিকে জাগ্রত করে নতুন ভোটব্যাঙ্ক গড়েছে, তাকে আরও জোরদার করার পথেই তাঁরা চলবে। বাম ভোটের একাংশ এবং তৃণমূল থেকে বিদ্রোহী নেতাদের যোগদান এই প্রক্রিয়াকে আপাত শক্তিশালী করে চলেছে। জাতীয় স্তরে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিজেপির প্রভাব বাড়াবে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে। পাশাপাশি বিরোধীরাও সংঘবদ্ধ হওয়ার পথে এগুবেন এই সম্ভাবনাও প্রকট হয়ে উঠছে।

তবে বিজেপির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ স্থানীয় সাংগঠনিক দুর্বলতা। রাজ্যের নেতৃত্ব এখনও কেন্দ্রনির্ভর, গ্রামীণ এলাকায় আস্থা গড়তে সময় লাগবে। তৃণমূলের শক্ত ভিত্তি, বিশেষ করে মহিলা ভোটাররা বিজেপির জন্য হুমকি।

এছাড়া নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তি;হিংসা, ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ এড়াতে বাঙালিয়ানার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, না হলে বাম- গণতান্ত্রিক শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়ন না হলে ভোটাররা মারাত্মক ক্ষুব্ধ হতে পারেন। বিশেষ করে ২ কোটি বেকারের আগামি ৫ বছরে চাকরির প্রতিশ্রুতি পালনের বিষয়টি।

বিজেপির নীতি বাংলার অর্থনীতিকে দেশে শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মূলত কৃষি-নির্ভর জনগণের জন্য 'এমএসপি' এবং স্বনির্ভরতা নীতির সমন্বয় চ্যালেঞ্জিং। সামাজিকভাবে, বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য রক্ষায় বিজেপিকে সতর্ক থাকতে হবে। মুসলিম ভোটারদের (প্রায় ২৭ শতাংশ) একীভূতকরণ না করলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে পারে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ বাড়লে ইতিবাচক, কিন্তু তৃণমূলের স্বাস্থ্য সাথী, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী-র মতো স্থানীয় কল্যাণমুখী প্রকল্পের সহজ বিকল্প তৈরি করতে হবে। আশা করা যায় 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার কেন্দ্র থেকে তহবিল আনতে সক্ষম হবে। গ্রামীণ মজুরদের বছরে ১২৫ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, রাস্তা সংস্কারের বন্ধ রাখা কাজগুলি অবিলম্বে চালু হবে। মনে রাখতে হবে বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নেমে লড়াইয়ের রাজনীতিতে এই রাজ্যে শুধু নয় দেশের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে অন্যতম। সেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে মোকাবিলা করতে হবে। রাজ্যে আগামি দিনে বিজেপি সরকারের পথচলা সফল হতে হলে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং বাঙালি মনকে আকর্ষণ করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পুনর্গঠন এবং বামেদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বিজেপিকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নিতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তনকে পরিপক্ক করলে বাংলা উন্নয়নের নতুন যুগে প্রবেশ করবে, নতুবা সংকল্প পত্র দুই মলাটের মধ্যেই থেকে যাবে। তাহলে বিপুল সংখ্যার আসনের জয় সত্ত্বেও অতীতের সরকারগুলির মতই পরিণতি হতে পারে বাংলার বিজেপি সরকারের।

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে বাংলার রাজনীতির ব্যাতিক্রমী যুগের সূচনা করেছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সুশাসন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে রাজ্যকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর সাথে বাঙালিয়ানা-ধর্মনিরপেক্ষতার ভারসাম্য রক্ষায় সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। আইনি চ্যালেঞ্জ, নির্বাচনোত্তর হিংসা, অশান্তি ও বিরোধী দলগুলির কর্মীদের হুমকির পথ এড়াতে হবে। বাস্তবায়ন ব্যর্থ হলে ভোটাররা মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন। নতুন বিজেপি সরকারের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো- সতর্কতা ও সমন্বয়। গণ আন্দোলন থেকে উঠে আসা মুখ শুভেন্দু অধিকারী সেই কাজে কতটা সফল হন তা দেখার জন্য এই সরকারকে পাঁচ বছর সময় দিতে হবে।

দেশের খবর

অবশেষে বামেদের শেষ দূর্গ হাতছাড়া হল

অমিতাভ সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার পর কেরালা। গত দশ বছর টানা শাসনের পর পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে বাম বা এলডিএফ বলতে গেলে গোহারা হেরে গেল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফের কাছে। ইউডিএফ জয়ী হয়েছে ১০২ টি আসনে,যার মধ্যে কংগ্রেসের আসন ৬৩ টি,ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলীম লীগ বা আইইউএমএল পেয়েছে ২২ টি আসন। অপরদিকে এলডিএফের প্রাপ্ত ৩৫ টি আসনের মধ্যে সিপিএমের ঝুলিতে গেছে ২৬ টি আসন,সিপিআই জয়ী হয়েছে ৮ টি আসনে। বলতে গেলে বাম দলগুলি এবারের নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়েছে। তারা ৩২.৮২ ভোট পেয়েছে। এনডিএ পেয়েছে তিনটি আসন, ১২.৭৬ ভোট পেয়ে। ইউডিএফ পেয়েছে ৪৪.১৯ ভোট। এবারের নির্বাচনে গত মন্ত্রীসভার ১২ জন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন।

কয়েকদিন ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনার পর গত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশনকে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে ঘোষনা করা হয়। জানা গেছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপালের পক্ষে বেশীরভাগ বিধায়ক থাকলেও শরিক দলের সমর্থন ও জনপ্রিয়তার নিরিখে সতীশন এগিয়ে ছিলেন। শুধু তাই নয় সতীশন গত পাঁচ বছর বিরোধী নেতা হিসাবে বাম সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন,এটাও তার মনোনয়নে সাহায্য করেছে। ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসাবে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর সমর্থনও সতীশনকে এই পদ পেতে এগিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

কেন সিপিএমের নেতৃত্বে এলডিএফ এতটা পর্যুদস্ত হল?

কেরলার নির্বাচনী ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই রাজ্যে কোন দলের সরকারের আয়ু পাঁচ বছরের বেশী নয়। একাধিকবার সরকার পাঁচ বছর পূর্ণ করতে পারে নি। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। ইউডিএফ ও এলডিএফের মধ্যে ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে ভাগাভাগি হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের ও রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে ধরা হয়। এলডিএফের ইএমএস নামবুদ্রিপাদ,অচ্যুত মেনন,নায়নার,অচ্যুতানন্দ থেকে পিনারাই বিজয়নের মত নেতা যেমন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন,তেমনি ইউডিএফের তরফে করুণাকরণ,একে এন্টনি,ওম্মানচন্ডীর মত নেতারা এই আসনে আসীন হয়েছেন। বিজয়ন ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কোবিদের সময় তিনি যথেষ্ট ভালভাবে রাজ্য সামলেছিলেন বলেই সম্ভবত তিনি উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার দলকে জিতিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

যদিও একসময়, ১৯৬৯ সালে ভাডিকূল রামকৃষ্ণণ হত্যাকান্ডে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হন। তাসত্ত্বেও পরবর্তীকালে সিপিএম তাকে দলে ফিরিয়ে এনেছিল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কৌশল তৈরীর দক্ষতার জন্য। তার নাম হয়ে গিয়েছিল ক্রাইসিস ম্যানেজার। তখনও তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। তাসত্ত্বেও কেরলার মানুষ তাকে দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের পাঁচবছর তার নামে একাধিক অভিযোগ ওঠে। স্বৈরতন্ত্র পদ্ধতিতে চলা থেকে দুর্নীতি, একেরপর এক কেলেঙ্কারি,মিডিয়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহার, মতাদর্শের সঙ্গে আপোষ ইত্যাদি।

তিনি দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না।একনায়কের মত দলকে পরিচালিত করতেন বলে অভিযোগ। তার নেতৃত্বর ধরণ সম্পর্কে দলীয় কর্মী ও অন্যান্য নেতাদের আপত্তি থাকলেও তাতে তিনি কর্ণপাত করতেন না। তাই বিক্ষুব্ধ টিকে গোবিন্দন,জি সুধাকরণ বা ভি কুনহিকৃষ্ণণের মত নেতারা পার্টির বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হয়েছেন।

শিক্ষা,স্বাস্থ্য, পৌর বিষয়ক,শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার।শবরীমালা থেকে সাড়ে চার কেজি সোনা চুরির কোন কিনারা করতে পারে নি তার সরকার। উল্টে শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার নরম হিন্দুত্বের পথ নিয়েছিল যা কেরালার ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানুষ ভালভাবে নেন নি। বিজেপির সঙ্গে তাদের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছিল না।

দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে দুষ্ট এই সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর কন্যা বীনা বিজয়নের নামে জালিয়াতির অভিযোগ। বীনার সংস্থা এক্সালজিক সলিউশন কোন পরিষেবা না দিয়ে কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইলস লিঃ এর কাছ থেকে ২.৭৩ কোটি টাকা আতসাৎ করেছে। সোনা পাচার কান্ডে মন্ত্রী ও আমলাদের যোগ যা এক অভিযুক্ত স্বপ্না সুরেশ আদালতে বয়ান দিয়েছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন এই কান্ডে মুখ্যমন্ত্রী, তার স্ত্রী, কন্যা ও তার আমলারা জড়িত। এছাড়া ২০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘনসহ এসএনসি লাভালিন কেসের মত একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। ১৯৯৬ সালে নায়নার মন্ত্রীসভার বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন বিজয়ন। তিনি তখন তিনটি বিদ্যুতকেন্দ্রের সংস্কারের জন্য এসএনসি লাভালিন নামক কানাডার সংস্থাকে ৩৭৪.৫ কোটি টাকার বরাত দিয়েছিলেন,যা অত্যন্তঅত্যন্ত বেশী। সিবিআই তদন্ত চলছে।

বিভিন্ন মিডিয়ার প্রতিনিধির সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা ও পুলিশকে দিয়ে হেনস্থার ফলে পুরো সংবাদমাধ্যম সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার করে গিয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের যে অভিযোগ বিজেপি তুলেছিল তা আদৌ হিন্দুদের প্রভাবিত করেনি । মুসলীম সম্প্রদায়ের মানুষও বামেদের থেকে সরে কংগ্রেসের ওপর আস্থা রেখেছে।

এরই মধ্যে কেরালা বিধানসভায় প্রথম মুসলীম মহিলা ফাতিমা তা হিলিয়া নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেশায় আইনজীবী ও আইইউএমএল এর প্রার্থী ছিলেন।

সর্বোপরি বলা যায় এই রাজ্যের মানুষেরা সাম্প্রদায়িক ও বিভেদের রাজনীতি বর্জন করেছে।

আসাম : বাঙালি বিদ্বেষ পরিবর্তিত হয়েছে উগ্র মুসলিম বিরোধীতায়।

মনিরুল হক

গত শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকেই অসমীয়া জাত্যাভিমানকে সামনে রেখে 'বঙ্গাল খ্যাদা' আন্দোলন শুরু করে । ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাকি রোডের কাছে নেলি নামে জনপদে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে । সাতের দশকের শেষ থেকে ' সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন' এবং 'সারা আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদ' -এর নেতৃত্বে সমগ্র আসাম জুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয় তা ক্রমে বাঙালি এবং

বাংলা ভাষা বিরোধী এক কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে।রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৫ সালে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এক সমঝোতায় আসেন । সাক্ষরিত হয় আসাম চুক্তি । ওই বছরের শেষের দিকে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে 'অসম গণ পরিষদ' রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে। পরে আরও একটি ৫ বছরের মেয়াদে এই দলটি রাজ্য শাসনের আধিকার পায়। এরপর ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাকি সময়কালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে যায় কংগ্রেস দলের হাতে। ২০১৬ সালে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। এজিপি (অগপ) থেকে কংগ্রেস হয়ে বিজেপিতে আসা হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রী হন ২০২১ সালে।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে আবার নতুন করে বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করা হয়। আর এই কার্যক্রম শুরু হয় বিজেপি সরকারের পরিচালনায়। হিমন্তবাবু বুঝেছিলেন বাঙালি বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখতে পারলে আসামে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবেন। প্রায় ২০ লক্ষ বাঙালিকে বে-নাগরিক বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। অনেককে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। কিন্তু হিসাবে দেখা যায় এই প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের সিংহভাগ ধর্মে হিন্দু। বিজেপির পক্ষে এটা আত্মঘাতী একটা অবস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে বেশ দ্রুত আসাম সরকার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। তারা 'অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে হিন্দুদের বাদ দিয়ে শুধু মুসলমানদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে আমরা বুঝি, দেশভাগের পর হিন্দুরাই ব্যাপক সংখ্যায় পাকিস্তান থেকে ভারত এসেছেন/ আসতে বাধ্য হয়েছেন। একই ঘটনা সীমান্তবর্তী আসামেও ঘটেছে । সুতরাং চাইলেই তো আর আসামে গাদাগাদা 'মুসলমান' পাওয়া যাবে না যারা বিজেপির ভাষায় 'অনুপ্রবেশকারী'। অতএব টার্গেট করা হল সর্বস্তরের মুসলমানদের যারা যুগ যুগ ধরে বর্তমান আসাম রাজ্যের সীমানার মধ্যে বাস করছেন। দেশের নাগরিকত্ব আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে তাদের ভিটে- চাষের জমি - ব্যবসা - জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এরপর এইসব অপকর্মের কথা সোচ্চারে ও সোল্লাসে দেশজুড়ে প্রচার করা হচ্ছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী হাস্যমুখে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন এই বলে যে, এইসব অপকর্ম আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা হবে। ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় সংবিধান, দেশের আইন, সর্বজনীন মানবিকতা, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা-- সবকিছুকে পদদলিত করে মুসলিম-নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে আসাম বিজেপি। আর এই প্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠিত হল ২০২৬ সালের আসাম বিধানসভার নির্বাচন।

সারা দেশের মত আসামেও চলছে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষের ঢেউ। সেই ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছেন হিন্দু জনগনের বৃহদংশ। ধর্ম 'প্রতিষ্ঠার' এই সুযোগ তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস বা অন্য কোন দলই তো এমন সুযোগের ডালি নিয়ে তাঁদের কাছে আসে নি। উল্টে তারা বলেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, ধর্মসমন্বের কথা অথবা ধর্মহীন সমাজের কথা। জীবন-জীবিকা-রাষ্ট্রপরিচালনায় হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দু গৌরবের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার কাজ বিজেপি-ই তো করছে। এসব আগে তো কেউ করে নি। এই ভারত তো সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দু। মুসলিমরা বহিরাগত। এইসব প্রাণপ্রিয় কথা একমাত্র বিজেপি-ই বলে, দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে। এ আমার দেশ, এখানে কে তুমি মুসলিম ! তফাৎ যাও।

বিজেপির এই মুসলিম বিরোধী প্রচারের ফাঁদে আটকা পড়েছেন দরিদ্র থেকে ধনী, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, গ্রামীণ থেকে শহুরে, সব স্তরের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা । বাদ থাকছেন অল্প কিছু মানুষ। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি না করা অথবা অস্বীকার করাটা এক মস্ত ভুল। তীব্র মূল্যব্যদ্ধি, চাকরিহীনতা, কর্মহীনতা,বেকারি, অনিশ্চিত জীবন সবকিছু হেরে যাচ্ছে ধর্মপ্রীতির কাছে, হিন্দুত্ববাদের কাছে, মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার কাছে। সারা মধ্য-উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে একই কাহিনী। আসাম তার ব্যতিক্রম হয় কি করে ?

বর্তমান সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই আসামের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোট জয়যুক্ত হয়েছে বিপুল ভোটে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অনেক বেশি আসন পেলেও তাদের জোট ও কংগ্রেস জোটের ভোট পার্থক্য ছিল সামান্য কিন্তু এই বিধানসভা নির্বাচনে দুই জোটের প্রাপ্ত ভোটের পার্থক্য অনেক বেড়েছে। গতবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু এবার বিধানসভা ভোটেই তিনি পরাস্ত হয়েছেন। বিধানসভায় কংগ্রেস পেয়েছে ১৯ টি আসন এবং তাঁদের সঙ্গী রাইজর দল পেয়েছে ২ টি আসন। অপরদিকে বিজেপি জোটের ১০২ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৮২ টি আসন, আসাম গণ পরিষদ ও বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট ১০ টি করে আসন। আর এ আই ইউ ডি এফ পেয়েছে ২ টি এবং তৃণমূল ১ টি আসন।

এটা ঘটনা যে বাংলাদেশে জামায়াত ইসলামের নেতৃত্বে ইসলামী উগ্রবাদের রমরমা ও তাদের তীব্র ভারত বিদ্বেষী প্ররোচনা এ পারের মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস- আসাম গণপরিষদের আসাম বা বাম-তৃণমূলের পশ্চিমবঙ্গ যে বিজেপির খপ্পরে পড়বে তা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও একেবারে অকল্পনীয় ছিল না।

সংঘী রাজ্যপালের কূট কৌশল ব্যর্থ : তলপতি বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী

শুভাশিস মজুমদার

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রথা ও পরম্পরার তোয়াক্কা না করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে কোনো উপায়ে বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করা বা কংগ্রেস তথা বিরোধী দলকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়ার অনেক উদাহরণ ইতিমধ্যেই দেশে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই বিজেপি তথা আরএসএস পন্থী রাজ্যপালদের নির্লজ্জ ভূমিকা দেখা গেছে। ২০১৭ সালে মণিপুর ও গোয়াতে, এবং ২০১৮ সালে মেঘালয়ে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হিসেবে বিধানসভায় জয়ী হলেও সংখ্যা গরিষ্ঠতা থেকে মাত্র দু এক আসন কম থাকায় সংঘী বা বিজেপি পন্থী রাজ্যপালেরা কংগ্রেসকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানায় নি। বিজেপি অন্যান্য দল ভাঙ্গিয়ে, বা কৌশলে তাদেরকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে সরকার গঠন করে। সেই সময়ে রাজ্যপাল ছিলেন যথাক্রমে মণিপুরে প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী নাজমা হেফাতুল্লাহ , গোয়াতে বিজেপির প্রাক্তন মহিলা মোর্চার সভাপতি মৃদুলা সিনহা, এবং মেঘালয়ে প্রাক্তন সংঘ পরিবারের সদস্য গঙ্গা প্রসাদ চৌরাসিয়া। আবার, ২০১৯ সালে মহারাষ্ট্রের তত্কালীন সংঘী রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোসিয়ারি ভোর রাতে রাজভবনে গোপনে বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রীর এবং অজিত পাওয়ারকে উপ মুখ্যমন্ত্রীর শপথ বাক্য পাঠ করান। উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকলেও যে কোনো উপায়ে বিজেপিকে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে দেওয়া। যদিও তখনকার মতো সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে শিবসেনা দলকে দু টুকরো করে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সরকারের পতন ঘটিয়ে বিজেপি মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসে। এই সব প্রক্রিয়ায় বিজেপির দ্বারা কেন্দ্রীয় এজেন্সির (ইডি, সিবিআই) অপব্যবহার, মোটা অংকের টাকার লেনদেনের ও রাজনৈতিক পদের প্রলোভন দেখানোর অভিযোগ বিরোধী দল গুলির পক্ষ থেকে বার বার তোলা হয়েছে।

২০১৮ সালে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের পরে দেখা গিয়েছিল বিপরীত ছবি। বিজেপি ১০৪ আসনে জয়ী হয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেলেও সরকার গঠনের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠতা (১১৩) পায়নি। অপর দিকে কংগ্রেস ৭৮ এবং জেডি (এস) ৩৭ আসনে জয়ী হয়ে তৎপরতার সঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী জোট গঠন করে সরকার গঠনের দাবী জানায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সংঘী রাজ্যপাল ভাজুভাই ভালা বিজেপিকেই ডাকেন সরকার গঠনের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী হন বিজেপির ইয়েদুরাপ্পা। সুযোগ পেয়ে বিজেপি জোর চেষ্টা চালায় অন্য দল থেকে বিধায়ক ভাঙ্গানোর। কিন্তু কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কংগ্রেস ও জেডি (এস) বিধায়কদের এক জোট রেখে বিজেপির প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। শীঘ্রই আদালতের নির্দেশে বিধানসভায় ইয়েদুরাপ্পা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হলে কংগ্রেস জেডি(এস) জোট সরকার গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যপালেরা বিজেপির ক্ষমতা দখলে এই ভাবেই সাহায্য করে গেছেন।

সদ্য তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর আরো একবার এই কুনাট্য দেখা গেল কট্টর আর এস এস পন্থী রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকরের দ্বারা। ২৩৪ আসনের বিধানসভায় তলপতি বিজয়ের নেতৃত্বে টিভিকে ১০৮ টি আসনে জয়লাভ করে একক সর্ববৃহৎ দল হিসেবে সরকার গঠনের দাবি জানালে এই রাজ্যপাল বার বার তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি কংগ্রেসের পাঁচ বিধায়ক এবং সিপিএম ও সিপিআই এর চার (২+২) বিধায়ক, মোট ১১৬ বিধায়কের (বিজয় নিজে দুটি আসন থেকে জয়লাভ করেছেন) সমর্থন নিয়ে টিভিকে সরকার গড়ার আবেদন জানালেও রাজ্যপাল রাজভবনেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলেন। প্রথা মাফিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা রাজভবনে নয়, বিধানসভায় পরীক্ষিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ছিলেন অনড়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য বিজয়ের প্রয়োজন ছিল ১১৮ বিধায়কের সমর্থন। শেষে, দলিত নেতা টি থিরুমাভলাভনের দল ভিসিকে তাদের দুই বিধায়কের বিজয়ের প্রতি সমর্থন জানালে এবং বিজয় ১১৮ জন বিধায়কের সমর্থন পেলে রাজ্যপাল আর্লেকর বাধ্য হন বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করাতে।

কংগ্রেস অভিযোগ জানিয়েছে, রাজ্যপাল ও বিজেপি আসলে বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী হতে বাধা দিয়ে তামিলনাড়ুতে এনডিএ-র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এআইএডিএমকে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে ভোটে লড়েছিল। বিজেপি মাত্র একটি আসনে জিতেছে তামিলনাড়ুতে। এই অবস্থায় ৪৭ আসনে জিতে বিজেপির (পড়ুন মোদী শাহ্-র) প্ররোচনায় এআইএডিএমকে-র এডাপাড়ি পলানিস্বামী সরকার গঠনের জন্য ৫৯ আসনে জয়লাভ করা ডিএমকে - র স্মরণাপন্ন হয়। এআইএডিএমকে - র সি ভে সানমুগম গোষ্ঠী এর বিরোধীতা করে। এআইএডিএমকে কোনো ভাবে সরকার গড়লে দিল্লি থেকে বিজেপি সেই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে কংগ্রেস ও বামেদের অভিযোগ।

অবশেষে বিধানসভার আস্থা ভোটে বিজয়ের নেতৃত্বে টিভিকে ও তাদের জোট সঙ্গীরা ১৪৪ ভোটে জয়ী হয়। সানমুগাম গোষ্ঠীর ২৫ জন বিধায়ক বিজয়ের পক্ষে ভোট দেন। এআইএডিএমকে -র বাকি বিধায়করা বিজয়ের বিপক্ষে ভোট দেন। ডিএমকে দলের সমস্ত বিধায়ক ভোট দানে বিরত থেকে সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। গণতন্ত্রের জয় হয়।

ব্যর্থ ও হতাশ মোদী কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, কংগ্রেস পিছন থেকে ডিএমকে-কে ছুরি মেরেছে। কংগ্রেস পরিষ্কার করে দিয়েছে, বিজেপির প্রভাব থেকে তামিলনাড়ুর সরকার বাঁচাতেই তারা টিভিকে-র সাথে জোট বেঁধে সরকারে যোগ দিয়েছে। তামিলনাড়ুর জনাদেশ এবার পরিষ্কার টিভিকে-র প্রতি ছিল। তাছাড়া ডিএমকে-র জোট সঙ্গী হলেও কংগ্রেসের কোন মন্ত্রিত্ব বিগত সরকারে ছিলনা। ২০২৬ এর ভোটে ডিএমকে-কংগ্রেস জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কংগ্রেসের কোন মন্ত্রিত্ব পাওয়ার কথা ছিল না। কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে বিজেপি ও তার বন্ধু দল এআইএডিএমকে-কে ক্ষমতা পাওয়া থেকে রুখতে ডিএমকে-কে নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন জানিয়ে গেছে।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিবৃতি

নাগরিক প্রতিবেদন : যখন 'দারিদ্র্যকে অগ্রাধিকারের তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে,' তখন মোদী দেশকে সঞ্চয় করতে শেখাচ্ছেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কংগ্রেস পার্টি প্রতিটি দিক তুলে ধরেছিল ,

অর্থনীতির ধ্বংসলীলা, টাকার ক্রমাগত পতন,পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজির মূল্য ও ঘাটতি, কৃষকদের জন্য সারের অভাব, খাদ্য নিরাপত্তার আসন্ন হুমকি,ওষুধের মূল্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর (MSME) সংকট, এবং আরও অনেক কিছু !

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কেন প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন ? কেন তিনি রোডশো করছিলেন ?

কেন তিনি বলছিলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে,' 'সবকিছু ঠিক আছে' ?

এখন নির্বাচন শেষ, দেশকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে , এটা করবেন না, ওটা কিনবেন না, এটা বাঁচান, Work From Home করুন !

মোদীজি, আপনার ১২ বছরের ব্যর্থতার জন্য দেশের মানুষকে দোষ দেবেন না !

গোস্বামী তুলসিরামজি ঠিকই বলেছেন, 'অনেকেই ধর্মোপদেশ দিতে পারদর্শী'।

সুব্রত গুপ্ত ও মনোজ আগরওয়ালের নিয়োগের সমালোচনায় রাহুল গান্ধি

নাগরিক প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যসচিব পদে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের নিয়োগ নিয়ে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। একই সঙ্গে ভোটার তালিকায় এস.আই.আর - এর কাজে নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে । বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একযোগে 'চোর বাজার' বলে কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) একটি পোস্টে রাহুল লেখেন, 'বিজেপি-নির্বাচন কমিশনের 'চোর বাজারে' যে যত বড় চুরি করবে, তার পুরস্কারও তত বড় হবে।' রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মনোজ আগরওয়ালকে এই শীর্ষ পদে বসানো হয়েছে। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। বিরোধী আসনে বসা তৃণমূল কংগ্রেসও এই নিয়োগকে 'নির্লজ্জ' বলে আখ্যা দিয়েছে। দলের নেতা সাকেত গোখলে 'এক্স' হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লিখেছেন, তিনি নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরিচালনা করলেন, সেই মনোজ আগররওয়ালকেই রাজ্যের মুখ্যসচিব করল নতুন বিজেপি সরকার। বিজেপি এবং কমিশন এখন ভোট চুরির বিষয়টি রাখঢাক না করে সরাসরি সামনে নিয়ে আসছে। নির্লজ্জতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।'

উল্লেখ্য, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পরেই এই ঘোষণা করা হয়। এর ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে ভোটপর্বের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক প্রধানের পদে এমন একজনকে বসানো হল, যাঁর নজরদারিতেই ক'দিন আগে রাজ্যে ভোট সম্পন্ন হয়েছে। আর এই পুরস্কার নিয়েই এখন সরগরম রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতি। মুখ্য সচিব পদে মনোজ আগরওয়ালের নিয়োগ সম্পর্কে গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন , 'উনি শুধু রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নন , উনি রাজ্যের অন্যতম সিনিয়র আমলা। আগে উনি সরকারের নানা দায়িত্বে কাজ করেছেন । বিজেপি সরকার আইন বহির্ভূত কিছু করেনি ।'

বিরোধীদের আক্রমণ অবশ্য অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ আর.জে.ডি নেতা অধ্যাপক মনোজ কুমার ঝা বলেন ত

নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের শীর্ষে নিয়োগ দেখে শেক্সপিয়রের ভাষায় বলতে হয় ' সামথিং ইস রটন ইন দ্য স্টেট অফ ডেনমার্ক ।' এই পচন লুকিয়ে রাখা হচ্ছে না । নৈতিকতার ভ্যান করে ধামাচাপা দেওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে না ।'

বারাসতে 'সিরাজ উদ্যান' থেকে 'শিবাজি উদ্যান'; নাম বদলে ক্ষোভ, বিতর্ক

নাগরিক প্রতিবেদন : বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হতেই উপড়ে ফেলা হল 'সিরাজ উদ্যান' নামটি। শুধু সেখানেই ক্ষান্ত হয়নি জয়ের জোয়ারে উন্মত্ত বিজেপি ও সংঘ পরিবারের কর্মী, সমর্থকরা। বারাসত পুরসভা পরিচালিত 'সিরাজ উদ্যান'-এর নাম পাল্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হল 'শিবাজী উদ্যান' লেখা একটি ফ্লেক্স-এর ব্যানার। ৪ মে রাতে ফলাফল প্রকাশের পর বারাসতের চাপাডালি মোড়ে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস 'তিতুমীর বাসস্ট্যান্ড' সংলগ্ন হাতিপুকুরে গড়ে ওঠা সুন্দর উদ্যানটির নাম বদলের মাধ্যমে জয়ের উঠসব উদযাপন শুরু করে বারাসতের বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখলেও রাতারাতি দেখা গেল এই বিরাট পরিবর্তন। জয়ের উৎসবের মধ্যে বিজেপি কর্মীরা বারাসতের সিরাজ উদ্যানের নাম সরিয়ে ওই পার্কের নামকরণ করল 'শিবাজি উদ্যান'। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েন ওই পার্কের নিরাপত্তা রক্ষীরা সহ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বারাসত পুরসভার অন্তর্গত চাঁপাডালি মোড় সংলগ্ন তিতুমির বাস টার্মিনাসের পাশে এই পার্কটি তৈরি করা হয়েছিল। তখন সেই পার্কের নামকরণ করা হয়েছিল 'সিরাজ উদ্যান'। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পার্কটি উদ্বোধন করেছিলেন। জনশ্রুতি, ১৭৫৭ সালের গোড়ায় কলকাতা বিজয় করে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার সময় বাংলার নবাব নিজের হাতি এবং ঘোড়ার বিশ্রামাগার হিসেবে বারাসতের এই এলাকার একটি পুকুরকে বেছে নিয়েছিলেন । সেই পুকুরের জল হাতি ও ঘোড়াদের খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করা হত । তাই তখন থেকে তার নাম মুখে মুখে হয়ে যায় 'হাতিপুকুর'। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার এলাকাটি পছন্দ হওয়ায় নাকি কিছু দিন সেখানে কাটিয়েছিলেন তিনি । নবাবের যুগ শেষ হলেও এখনও মানুষ সেই এলাকাটিকে হাতিপুকুর হিসেবেই চেনে । পুকুরের ঠিক মাঝেই রয়েছে একটি ছোট্ট টিলার মত একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপটিকে ঘিরে বিশালাকার গোলাকৃতি সেই পুকুরটি । সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাসকে ও স্মৃতিকে সামনে রেখেই তাঁর নামে বারাসত পুরসভা স্থাপন করে ওই পার্ক। পার্কের নামকরণ করা হয়েছিল সিরাজ উদ্যান। ছত্রপতি শিবাজি কখনোই বাংলায় আসেননি । তাঁর জীবনের সঙ্গে বাংলার কোনও যোগ নেই ।তবে তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন । তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য অন্যত্র উদ্যান স্থাপন করা যেতেই পারে । ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর ৫০ বছর পর থেকে বাংলায় মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ ও লুঠতরাজ শুরু হয়। সে আক্রমণের কাহিনি বাংলার লোক ছড়ায় সজিব হয়ে রয়েছে ।

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়লো/ বর্গী এলো দেশে /
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে /খাজনা দেবো কিসে ?/

মনে রাখতে হবে নৃশংস বর্গী আক্রমণের হাত থেকে বাংলার মানুষকে রক্ষা করেছিলেন সিরাজ এর দাদু নবাব আলীবর্দী খান। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হন। তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় । বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়। কিন্তু এই ইতিহাস কি উলে জ্বালা হবে ? বিজেপি ভোটে জয়লাভ করতেই সেই নাম মুহূর্তেই পরিবর্তন করে দেওয়া হল।

উদ্বোধনের আগে নতুনভাবে সংস্কার করে তার চারপাশে সিরাজউদ্দৌলার বিভিন্ন স্মৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও আমোদ প্রমোদের জন্য সেখানে রয়েছে বোটিং থেকে শুরু করে টয়ট্রেন-সহ বিভিন্ন ধরনের রাইডস। মনোরঞ্জনের জন্য এই পার্কটি কাছাকাছি হওয়ায়,পরিবহন যোগাযোগ ভালো হওয়ায় বারাসত ছাড়াও জেলার আশপাশের মানুষজন ভিড় করে থাকেন এখানে। এদিকে পার্কের নামকরণ বদল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই। বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'কয়েকজন বিজেপি কর্মী গিয়ে উদ্যানের নামকরণ করেছে শিবাজি উদ্যান। এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে কথা বলা হবে।' এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা তাপস মিত্র। তিনি জানিয়েছেন, 'দলের পক্ষ থেকে কেউ এমন নির্দেশ কাউকে দেয়নি। এর দায় দলের নয়।' তবে শুধু পার্ক নয়, ওই একই দিনে, রাজ্যে বিজেপির ঝড় উঠতেই বারাসাতের নপাড়া এলাকায় 'মসজিদবাড়ি রোড' এর সাইনবোর্ড বদলে 'নেতাজিপল্লি রোড' করে দেওয়া হয়।

বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায় পুলিশি হেফাজতে : গুজব ছড়ানোর তথাকথিত অভিযোগে

নাগরিক প্রতিবেদন: ইভিএম নিয়ে ভিত্তিহীন গুজব ও উস্কানিমূলক মন্তব্যের তথাকথিত অভিযোগে বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা ১২ মে গ্রেফতার করেছে। ব্যাঙ্কশাল আদালত ১৩ মে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে তদন্তের স্বার্থে তাকে ১৬ মে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ অনুযায়ী গর্গ চট্টোপাধ্যায় ৪ মে ভোট গণনার দিন;এবং তার আগেও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ইভিএম নিয়ে ভিত্তিহীন মন্তব্য ও উস্কানিমূলক কনটেন্ট পোস্ট করেন। এসব পোস্ট নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ভোট গণনা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ তৈরি করার আশঙ্কা তৈরি করেছে, যাতে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলা নির্বাচন অফিসারের অভিযোগ এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মত এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করে সাইবার শাখা।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, পদক্ষেপ নেওয়ার আগে গর্গকে তলব করা হয়; কিন্তু তিনি হাজিরা না দেওয়ায় ১২ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৩ মে তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করা হলে মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়। আদালত পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং তদন্তের স্বার্থে তাঁকে ১৬ মে পর্যন্ত রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাংলা পক্ষ জানিয়েছে, গ্রেফতারের ঘটনা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রের অংশ এবং কোনও আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়নি। দলের এক দায়িত্বশীল সূত্র দাবি করেছেন, গর্গের মন্তব্য সমালোচনার আওতায় হলেও তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়; প্রশাসন রাজনৈতিক বিরোধীতার কণ্ঠরোধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আইনজ্ঞদের মতে, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সবার আছে, কিন্তু যদি কোনো বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আইনশৃঙ্খলা বা নির্বাচন পরিচালনায় ব্যাঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি করে, তাহলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কবে, কী ধরনের পোস্ট বা মন্তব্য অপরাধ বলে গণ্য হবে;তার স্পষ্ট ব্যাখ্যার পাশাপাশি অনুকূল বিচারবিবেচনার প্রশ্নও ওঠে, বলছেন তাঁরা। গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রেফতারের পর থেকেই উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে। শহরের বিভিন্ন কোণ থেকে সামাজিক প্লাটফর্মে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের মতে, এটি বাকস্বাধীনতার পরিপন্থী। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন, মুঠোফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া রেকর্ড বিশ্লেষণ করে ঘটনায় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত গুজব রোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেছে। গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়ানো ও উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে তদন্ত শুরু হওয়া এবং পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ রাজনৈতিক ও আইনিভাবে সংবেদনশীল বিষয়ে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অন্তরায়হীন হলেও সেটি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। কোনও বক্তব্য যদি জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার আশঙ্কা তোলে, তখন আইনি নিয়ম মেনে তদন্ত করা যেতে পারে। তবু, রাষ্ট্রের উচিত বিবেচনা সহকারে, স্বচ্ছ ও দ্রুত অনুসন্ধান করা যাতে বাকস্বাধীনতা রক্ষিত থাকে এবং রাজনৈতিক বিরোধীকে দমন করার নজির তৈরি না হয়।

সর্বশেষ সংবাদ আজ গর্গ মামলায় কোর্টে ল্যাজেগোবরে হয় সরকার পক্ষ । গর্গর উকিল দেখায় যে পুলিশের নোটিশে অভিযুক্ত থানায় দেখা না করলে কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট বের করতে হয়। গর্গকে গ্রেফতার করতে কোর্ট কোনো ওয়ারেন্ট জারি করেনি। তিন দিনের পুলিশ কাস্টডির পর পুলিশ আর কাস্টডিতে চায়নি। জেল কাস্টডি চেয়েছে। সুতরাং আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার আর কিছু নেই। শুধুমাত্র হ্যারাস করার জন্য আটকে রাখতে চাইছে। গর্গর উকিল আরও বলেন, যে কারণে কেস দেওয়া হয়েছে, সেই কারণে কেস আসতে থাকলে শুধু সাইবার কেসেই থাকবে। কারণ নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গোটা দেশ প্রশ্ন তুলছে।।বিচারক একটি মামলায় বেল এবং অন্য একটি মামলায় ২২ তারিখ অব্দি জেল কাস্টডি দিয়েছে। উল্লেখ্য গর্গ চট্টোপাধ্যায় একজন মেধাবী ছাত্র ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিকাল ইনস্টিটিউটের গবেষক ।

পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলার পথ রাখতে হবে, দাবি আরএসএসের

নাগরিক প্রতিবেদন : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সাধারণ অধ্যক্ষ দত্তাত্রেয় হোসাবলে ১২ মে পাকিস্তানকে ডংকা (Pin Prick) বলে উপহাস করেছেন, কিন্তু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংলাপের দরজা বন্ধ করা উচিত নয় বলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই বক্তব্য বিজেপি-নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদি সরকারের দীর্ঘদিনের 'শূন্য সহনশীলতা' নীতিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর নামান্তর, একই সাথে সরকারের দ্বিচারিতা এবং জাতীয় নিরাপত্তায় অসংবেদনশীলতা প্রকাশ করছে।

নাগপুরে আরএসএসের এক জমায়েতে দত্তাত্রেয় এদিন বলেন, 'পাকিস্তান একটি তুচ্ছ ডংকা, তবু তার সঙ্গে কথা বলার পথ রাখতে হবে।' এখন সেই সময় এসেছে যখন পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ভারতীয় সেনারা প্রাণ হারাচ্ছেন এবং পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি সরকার গত ১২ বছরে পুলওয়ামা (২০১৯), উরি (২০১৬) এবং অন্যান্য হামলার পর বালাকোট বোমা হামলা ও সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো কার্যক্রম করে 'জঙ্গি' ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে। কিন্তু আরএসএসের এই নরম মনোভাব সেই ছবিকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করছে।

বিজেপির এই অসঙ্গতি জাতীয় নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি একদিকে 'পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়া' বলে চিৎকার করেন, অন্যদিকে গোপন কূটনীতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ চালান;যেমন ২০২১-এর গোপন বৈঠক। দত্তাত্রেয়-এর মন্তব্য এই মুখোশ খুলে দিয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, বিজেপি ভোটের জন্য 'হিন্দুত্ব'এবং 'পাকিস্তান-বিরোধী' স্লোগান ব্যবহার করে, কিন্তু বাস্তবে সন্ত্রাসবাদ রোধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না। ফলস্বরূপ, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বাড়ছে, সীমান্ত গ্রামগুলো অসুরক্ষিত।

এছাড়া, সরকারের বৈদেশিক নীতি ব্যর্থ। চিনের সঙ্গে গালওয়ান সংঘর্ষের পরও লা.এ.সি.তে অবস্থান হারানো, পাকিস্তানের সঙ্গে ইউএনএসসি-তে বাধ্যতামূলক সহযোগিতা;এসব বিজেপির 'শক্তিশালী ভারত' দাবির পরিপন্থী। আরএসএসের বক্তব্যে স্পষ্ট যে সংঘ পরিবার সরকারের এই নীতিকে সমর্থন করে না, যা কীনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি সরকারকে এখন স্পষ্ট অবস্থান জানাতে হবে। আরএসএসের মন্তব্য জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারের অযোগ্যতা উন্মোচন করেছে, এমনটাই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

হোসবলের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন , সম্প্রতি হোসবলে মার্কিন দেশ সফরে গিয়েছিলেন ।মনে হচ্ছে এই মার্কিন মুলুক সফরের প্রভাব হোসবলে ও আরএসএস - এর উপর পড়েছে । তাঁর একজন সহকর্মী স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছেন। তার প্রভাব হোসবলে ও আরএসএস - মেনে নিয়েছেন । এদিকে প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নরবণে বলেছেন , 'দু দেশের আমজনতার প্রধান সমস্যা রোটি , কাপড়া ও মকান । আমজনতার রাজনীতি নিয়ে কিছু করার নেই । যদি দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য হতে পারে , তাহলে দু'দেশের কেন হবে না ?'

মণিপুরে ৩১ জন অপহৃত কুকি ও নাগা মুক্ত

মিলি মুখার্জি

বিলম্বে পাওয়া সংবাদে জানা গিয়েছে মণিপুরের কাঙপোকপি এবং সেনাপতি জেলায় অপহৃত কুকি এবং নাগা সম্প্রদায়ের ৩৮ জনের মধ্যে ৩১জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গির্জার তিনজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

...অপহৃত কুকি সম্প্রদায়ের চারজন পুরুষ এবং ১০ জন মহিলাকে রাতে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের কোনও খোঁজ নেই। মুক্তি পাওয়া এক মহিলা বলেন, আমাদের চোখে পট্টি বাঁধা ছিল এবং হাত বেঁধে রাখা ছিল। আমরা ঠিকঠাক জানতাম না যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুকি এবং নাগা সম্প্রদায়ের মানুষরা অপহরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চালাচ্ছে। এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল জমি, পরিচয় এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে। ১৯৯০-এর দশক থেকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বড় ধরনের সরাসরি সংঘর্ষ কমে গিয়েছিল। তবে, ২০২৩ সালের মেইতেই-কুকি সংঘাত পুরোনো উত্তেজনাকে আবার উস্কে দিয়েছে। গত তিন-চার বছরে উখরুল এবং অন্যান্য পাহাড়ি এলাকায় নাগা ও কুকি গোষ্ঠীর মধ্যে হামলা বেড়েছে।মণিপুরে সহিংসতা বেড়েই চলেছে এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তা দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জাতীয় সীমান্তে অবস্থিত এই পুরো রাজ্যটির অস্তিত্বই আজ হুমকির মুখে। গত তিন বছরে মণিপুরে জাতিগত সহিংসতায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এই সহিংসতা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। শাসকদল,

নির্বাচনে আঞ্চলিক ও জাতিগত অনুভূতি উস্কে দিয়ে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। মণিপুর জ্বলছে, যা লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী নাগরিকের জীবনযাত্রা ব্যাহত করছে।মণিপুর একটি সুন্দর, সাহসী এবং শিক্ষিত রাজ্য। অতীতেও নাগা, কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ছিল, কিন্তু রাজ্যের ব্যর্থতা এই উত্তেজনাকে জাতিগত সহিংসতায় পরিণত করেছে।দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যে পারস্পরিক সহিংসতা আটকাতে না পারা একটা বড় ব্যর্থতা। নিরপেক্ষ নিরাপত্তা বাহিনীকে মোতায়েন করে, বিস্তৃত সংলাপের মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

(fb থেকে)।

ধারাবাহিক

কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(১০)

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল

১৯৭২ সালে সিপিএম তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ তোলে।

১৯৭০ সালে কেরলেও সিপিএম-এর সঙ্গে সিপিআই, আরএসপি ও মুসলিম লিগের ব্যাপক বিরোধের ও সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ওই রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে সিপিআই ও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আরএসপি, মুসলিম লিগ ও আরও দু-একটি দল ওই জোটে যোগ দেয়। সিপিআই নেতা অচ্যুৎ মেনন মুখ্যমন্ত্রী হন। পাঁচ বছর পর পরবর্তী নির্বাচনেও এই জোট পুনরায় নির্বাচিত হয় ও শ্রীমেনন আবারও মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। শুধু কেরল নয়, সারা দেশের মধ্যে এখনও অচ্যুৎ মেননের সরকার একটি আদর্শ সরকার বলে পরিগণিত হয়।

মনে রাখা দরকার কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআই-এর এই জোট আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদের যে 'গ্লোবাল প্ল্যান' ছিল তার অন্যতম কর্মসূচি ছিল ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দলকে যেভাবে হোক ক্ষমতাচ্যুত করা। ওই পরিস্থিতিতে সিপিআই একটি কমিউনিস্ট দল হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে প্রতিহত করার যথার্থ রণনীতিই গ্রহণ করেছিল।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দুত্ববাদীদের সামাজিক ভিত্তির প্রসার

১৯৭১ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। ব্যাংক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ, 'গরিবি হঠাও' আহ্বান এই জয়ের অন্যতম কারণ ছিল। উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি সিপিআই ও সিপিআই (এম) সমর্থন করেছিল। দুই দল নিজেদের বিরোধের জন্য আলাদাভাবে লড়লেও তাদেরও ১৯৬৭ সালের তুলনায় শক্তিবৃদ্ধি (প্রাপ্ত ভোট ও আসন সংখ্যার দুইয়েরই নিরিখে) হয়েছিল। কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে কমিউনিস্টদের শক্তি হ্রাস হয়নি। এই তথ্যটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে আগেই দেখানো হয়েছে।

যদিও ১৯৬৭ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালের প্রাপ্ত ভোট ও আসন সংখ্যার নিরিখে জনসংঘর (বিজেপির আদিরূপ) শক্তি হ্রাস হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী জোট করে জনসংঘ তাদের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। শহরাঞ্চলের বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় ও বানিয়াদের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে মধ্য ও ধনী চাষিদের মধ্যেও তাদের প্রভাব তৈরি হয়। ১৯৬৭ তে কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে আসা আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে ঐক্য করে চিরাচরিত কংগ্রেস প্রভাবিত জনসাধারণের মধ্যে তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে ঐক্য করে অনুরূপভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে হিন্দি বলয়ে সোশ্যালিস্টদের যে প্রভাব তৈরি হয়েছিল তার মধ্যেও জনসংঘ প্রবেশ করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশ ভাগ ও স্বাধীনতার সময় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, স্বাধীন ভারতে তা প্রশমিত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়। পণ্ডিত নেহরুর সুদৃঢ় নেতৃত্বে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয়। ১৯৬৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা তুলতে পারেনি। প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল (১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২) দেখলেই তা বোঝা যাবে। ওই তিন সালে জনসঙ্ঘ ' র আসন ছিল যথাক্রমে ৩ , ৭ , ১৩ । কিন্তু কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের ফলাফল দেখলেই বোঝা যায় তাদের এই সময়ে ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন রাজ্যে যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকারগুলি গঠিত হয়, তাদের দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ জনসঙ্ঘ গ্রহণ করে। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে হিন্দি বলয়ের বিভিন্ন রাজ্যে ও পশ্চিমাঞ্চলে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' ব্যাপকভাবে শুরু হয়।সর্বত্রই দাঙ্গার আগে ও পরে আর এস এস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন জনসঙ্ঘ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে সক্রিয় ছিল। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়। এই মনোভাবকে ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়াটাও ছিল

খুবই চতুর কৌশল। এস ভি ডি (সংযুক্ত বিধায়ক দল) শাসিত সরকারগুলির দুর্বলতার ফলেও দাঙ্গা বৃদ্ধি পায়। ওই সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান জাতীয় ঐক্য পরিষদ প্রকাশ করে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৬-তে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে ১৩২টি, ১৯৬৭-তে ২২০টি, ১৯৬৮-তে ৩৪৬টি। দাঙ্গা বৃদ্ধির এই হার ১৯৬৯ ও ১৯৭০-এও বজায় ছিল (গান্ধি উত্তর ভারত - রামচন্দ্র গুহ , আনন্দ, পৃষ্ঠা-৩৮৮)। ১৯৭০ সালের ৩১ মে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পত্রিকায় খুশবন্ত সিংহ লিখেছিলেন যে ভারতের কিশোর-কিশোরীরা এখন ভুগোল জানছে কোথায় দাঙ্গা হচ্ছে তা দেখে। যথা আলিগড়, রাঁচি ,আমেদাবাদ, জলগাঁও, ভিওয়ান্দি এখন আর বিদ্যাচর্চা বা সংস্কৃতি বা উৎপাদনশীলতার কেন্দ্র নয়। ধর্মের নামে পরস্পরকে হত্যা করা হচ্ছে।খুশবন্ত সিংহ দেখান ওই দাঙ্গাগুলিতে যারা নিহত হয় তাদের প্রতি দশজনের মাধ্য নয়জন মুসলমান। ঘরবাড়ি বা ব্যবসা ধ্বংসের ক্ষেত্রেও চিত্রটি অনুরূপ।পুলিশ এসে যাদের ধরে নিয়ে যায় তাদের দশজনের মধ্যে নয়জনই হয় মুসলমান। মুসলিমরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে আর নিরাপদ বোধ করে না। তারা নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করছে।

দাঙ্গার ফলে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি সাম্প্রদায়িক শক্তির অতি পুরাতন ও একটি সফল রণকৌশল।এ প্রসঙ্গে আরেকটু; পিছিয়ে গিয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার (Central Lagislative Assembly) নির্বাচন হয়। তখন মুসলমানদের জন্য পৃথক আসন ছিল যেখানে মুসলমানরাই শুধু ভোট দিতে পারত (পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী)। ওই নির্বাচনে এতদসত্ত্বেও মুসলিম লিগের ভরাডুবি হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বাংলা (অবিভক্ত), পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধ-কোথাও মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলায় তাদের ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার করতে হয়। যদিও তা বিরোধের ফলে ভেঙে যায়। পরে হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সরকার হয়। সিন্ধ-এ কংগ্রেসের সমর্থনে জাস্টিস পার্টির সরকার গঠিত হয়। আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করে।চৌধুরী খালিকুজ্জমান, মুসলিম লিগ নেতা এই নির্বাচনের পর বলেছিলেন ' Here is a party of Muslims without the support of the Muslims '. সেই মুসলিম লিগ ১৯৪০-এ তাদের লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গ্রহণ করল। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের প্রায় সব নেতারা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় ও আত্মগোপন করার ফলে দেশের ফাঁকা মাঠে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে তারা প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় ও অবশেষে যার অনিবার্য পরিণতিতে দেশ ভাগ। ওই সময়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিভাজন আর.এস.এস. ও হিন্দু মহাসভাও চেয়েছিল। এরা এবং মুসলিম লিগ সবাই আইনসিদ্ধ ছিল। কোনও দলই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়নি। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এই খেলায় ব্রিটিশ রাজশক্তিও পূর্ণ মদত দেয়। দাঙ্গা নিবারণে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না।

এই রণকৌশল গ্রহণ করেই সংঘ পরিবার ক্রমাগত দাঙ্গা বাধিয়ে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির কৌশল ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই গ্রহণ করেছে। ওই সময়ের দাঙ্গায় সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য দুটি ছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। এই দুই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ মাগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের গণভিত্তি গড়ে তুলেছিল। সমগ্র বিহারে ও উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে একক শক্তিতে লড়ে ১৯৬২ সাল থেকেই অবিভক্ত পার্টি ও পরে সি পি আই বেশ কিছু সংসদীয় আসনে ও বিধানসভা আসনে জয়লাভ করতে শুরুত্বকরেছিল। উত্তর প্রদেশে এমনকী যার মধ্যে ছিল বারাণসী, চিত্রকূট ও হরিদ্বারের মতন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। সেই সব অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী শক্তি থাবা বসাতে শুরু করল।

কমিউনিস্টদের অতীব উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল পাঞ্জাবে। সেখানে আকালি দল ও বিজেপির মিলিত জোট কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয়ের পক্ষেই বিপদের কারণ হয়ে উঠল। কিন্তু অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা ও আকালিদের সঙ্গে জোট রাজনীতির আত্মঘাতী কৌশল এখানেও কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ পতনের সূচনা করল। মনে রাখা দরকার পাঞ্জাবে গদর পার্টির বিপ্লবীদের একটি বড় অংশ পাতিয়ালা, ফরিদকোট, নাভা কপুরথালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে চৌধুরী খালিকুজ্জমান, মুসলিম লিগ নেতা এই নির্বাচনের পর বলেছিলেন Here is a party of Muslims without the support of the the Muslims.' সেই মসলিম লিগ ১৯৪০-এ তাদের লাহৌর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করল। আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতারা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় ও আত্মগোপন করার বাংলা ফাঁকা মাঠে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে তারা প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় ও অবশেষে যার অনিবার্য পরিণতিতে দেশ ভাগ। ওই সময়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিভাজন আর এস এও হিন্দু মহাসভাও চেয়েছিল। এরা এবং লিগ সবাই আইনসিদ্ধ দল ছিল। কোনও শক্তিই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় নি। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এই খেলায় ব্রিটিশ রাজশক্তিও পূর্ব মদত দেয়।দাঙ্গা নিবারণে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না।

এই রণকৌশল গ্রহণ করেই সংঘ পরিবার ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির কৌশল ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই গ্রহণ করেছে। ওই সময়ের দাঙ্গায় সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য দুটি ছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। এই দুই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ মাগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের গণভিত্তি গড়ে তুলেছিল। সমগ্র বিহারে ও উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে একক শক্তিতে লড়ে ১৯৬২ সাল থেকেই অবিভক্ত পার্টি ও পরে সি পি আই বেশ কিছু সংসদীয় আসনে ও বিধানসভা আসনে জয়লাভ করতে শুরুঙ্ম করেছিল। উত্তর প্রদেশে এমনকী যার মধ্যে ছিল বারাণসী, চিত্রকূট ও হরিদ্বারের মতন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। সেই সব অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী শক্তি থাবা বসাতে শুরু করল।

কমিউনিস্টদের অতীব উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল পাঞ্জাবে । সেখানে আকালি দল ও বিজেপির মিলিত জোট কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয়ের পক্ষেই বিপদের কারণ হয়ে উঠল। কিন্তু অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা ও আকালিদের সঙ্গে জোট রাজনীতির আত্মঘাতী কৌশল এখানেও কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ পতনের সূচনা করল। মনে রাখা দরকার পাঞ্জাবে গদর পার্টির বিপ্লবীদের একটি বড় অংশ পাতিয়ালা, ফরিদকোট, নাভা রুপুরথালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশের খয়ের খাঁ রাজাদের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন সংগঠিত করে কমিউনিস্টদের প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করেছিল । একইভাবে ভূপাল ও ইন্দোরের রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।মনে আছে এক সময় ইন্দোর থেকে সাংসদ নির্বাচিত হতেন কমিউনিস্ট নেতা হোমি দাজি। ভুপাল থেকে বিধায়ক হতেন সাকির আলি খাঁ।

ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুর (বর্তমান রাজধানী) থেকে এক সময় কমিউনিস্ট নেতা সুধীর মুখার্জী নির্বাচিত হতেন। বয়লাডিলার লোহা খাদান শ্রমিকদের মধ্যে শক্তিশালী গণভিত্তি গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্টদের। আর এই প্রসঙ্গে বোম্বাই শহরের সুতোকল শ্রমিক আন্দোলন, গিরনি কামগড় ইউনিয়ন ও কমিউনিস্টদের একদা সুদৃঢ় ভিত্তির কথা মনে করা যেতে পারে। এখন ওখানে শিব সেনা ও বিজেপির দাপাদাপি।

মধ্য ও উত্তর বিহারের কৃষক এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি জাত-পাতের গণ্ডি অতিক্রম করে সুদৃঢ় গণভিত্তি গড়ে তুলেছিল। অপরদিকে টাটানগরের শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে, খনি মজদুরদের মধ্যে ও আদিবাসী অঞ্চলে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। বিরাট এই রাজ্যের মধ্যে ছিল বর্তমান তেলেঙ্গানা,অন্ধ্র প্রদেশের বড় এক অংশ ও মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়ারা অঞ্চল ।এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে ।

বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কয়েকটি জেলায় শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে । গণনাট্য সংঘ ও প্রগতি সাহিত্য সংঘ বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করে । ছাত্র সংগঠন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে ।

এই গণভিত্তি কীভাবে,কেন ক্ষয়প্রাপ্ত হল ও সংঘ পরিবারে প্রভাব বৃদ্ধি পেল এবং তাতে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন কীভাবে সহায়তা করেছিল তা নিয়ে পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন ।

(চলবে)

জরুরী অবস্থা ও পরবর্তী পরিস্থিতি

সুশান্ত দাশগুপ্ত

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(১৭)

পাঞ্জাবের ক্ষত কী করে নিরাময় হবে

অপারেশন বু স্টার হয়ে যাওয়ার দু-তিন দিন পর চেহারতায় একজন শিখ আরেকজন শিখকে বলে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভিন্দ্রানওয়ালে আর জীবিত নেই?' আরেকজন শিখ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে , 'তুমি একজন শিখ হয়ে একথা বলছো ?' তার উত্তরে প্রথমজন বলে , 'ভিন্দ্রানওয়ালে কোনও সন্ত তো নয়ই, এমনকী সে খাঁটি শিখও নয়।'

এই ঘটনাটি বাস্তবের মোটামুটি একটি প্রতিফলন ছিল।

তবে শিখদের মধ্যে একটি বড় অংশ খুবই বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিল এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিল। আবার টেলিভিশনে, স্বর্ণমন্দিরকে একটি বৃহৎ অস্ত্রশালায় পরিণত করা হয়েছিল বলে যে প্রচার চলছিল, খুব কম লোকই তা মিথ্যা প্রচার বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। এই পবিত্র মন্দিরকে অস্ত্রশালায় পরিণত করার বিষয়টিকে কেউ কেউ সমর্থনও করছিল। একই সঙ্গে অন্যরকম উদাহরণও ছিল। একটি গ্রামে একজন বয়োবৃদ্ধ শিখ অন্তত ৫০ জন শিখকে বলছিলেন যে 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেনাবাহিনীর প্রবেশে আমরা ব্যথিত। কিন্তু অকালি নেতারা কেন ভিন্দ্রানওয়ালেকে সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিলেন যাতে সে স্বর্ণমন্দিরকে একটি সেনাছাউনিতে পরিণত করতে পারে? ভিন্দ্রানওয়ালেই বা কেন তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে স্বর্ণমন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মন্দিরের বাইরে যুদ্ধ করলেন না?

এই বৃদ্ধ যে শিখদের সামনে এই বক্তব্য রাখছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু সক্রিয় অকালি সদস্য ছিলেন। কিন্তু কেউই তাঁর কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

ভিন্দ্রানওয়ালের দেহ পাওয়া গিয়েছে বলে যখন তারা শুনল, হিন্দুরা স্বভাবতই সন্তুষ্ট হয়েছিল। কেউ কেউ এতে উৎসাহিত হয়ে আনন্দানুষ্ঠানও করতে চেয়েছিল। কিন্তু যারা শান্ত ও ভদ্রস্বভাবের তারা এর বিরোধিতা করে বলে, 'এটা খুবই দুঃখের যে সেনাবাহিনীকে দরবার সাহিব-এ ঢুকতে হয়েছিল। শুধু শিখরা নয় এতে আমরাও দুঃখ পেয়েছি। এমন কিছু বলা বা করা উচিত নয় যাতে আমাদের শিখ ভাইদের মনে আঘাত লাগে।

উগ্রপন্থী অল ইন্ডিয়া শিখ ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যরা বলে বেড়াচ্ছিল, 'যখন কার্ফু থাকবে না এবং সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে, তখন তারা মজা দেখিয়ে ছাড়বে। ভিন্দ্রানওয়ালে মারা যাননি। সঠিক সময়েই তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করবেন।'

কিছু উগ্রমস্তিষ্ক হিন্দু যুবক সাম্প্রদায়িক মনোভাব অবলম্বন করে বলছিল, 'এখন এই পর্যন্ত যা হয়েছে তা কিছুই নয়, প্রকৃত এবং যথার্থ শিক্ষা পরে দেওয়া হবে।' যদিও এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন হিন্দু যুবকদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না এবং তাদের অন্যরা তিরস্কার করে চুপ করিয়ে দেয়।

এটা এখন পরিষ্কার যে পাঞ্জাব এখনও এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির অবিলম্বে কিছু কর্তব্য ও পালন করতে হবে, এবং কিছু দীর্ঘমেয়াদি খ কর্তব্যও তাদের সামনে রয়েছে। এগুলি হলঙ্ঘ

ক) হিন্দু শিখ ঐক্য বজায় রাখার জন্য সমস্ত রকমের উদ্যোগ নিতে হবে। যে কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে কোনও প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, হিন্দু ও শিখদের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হয়েছে তা জোড়া লাগাতে হবে।

খ) যে সমস্ত নিরপরাধী মানুষ প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পাঞ্জাব সমস্যা বলে যেগুলিকে বলা হয়ে থাকে, যথা নদীর জল বিরোধ, চণ্ডীগড় ইত্যাদি, সেগুলির সমাধান করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

ঘ) আগামী দিনে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের হ মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে গভীর ও বিস্তৃত রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে তাই নয়, একই সঙ্গে শিখ ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও প্রচার চালাতে হবে।

শিখদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন গুরুদ্বার ও এমনকী স্বর্ণমন্দির থেকে নানারকম ভুল তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে যথা– ১) ভারতে শিখরা হচ্ছে ক্রীতাদাস ও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক যাদের প্রতিনিয়ত অবিচারের স্বীকার হতে হচ্ছে। ২) শিখধর্ম এবং শিখরা তখনই উন্নতি করতে পারবে যদি তাদের নিজেদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩) শিখরা একটি পৃথক জাতিসত্ত্বা। ৪) অকালি দলই শিখদের একমাত্র প্রতিনিধি। ৫) শিখদের জন্য, ধর্ম আর রাজনীতি সর্বদা হাত ধরাধরি করে চলবে। ৬) শিখদের অবশ্যই একটি পৃথক ও স্বাধীন রাজনৈতিক সত্ত্বা থাকতে হবে। ৭) ভারতীয় সংবিধানে বলা আছে যে শিখরা হিন্দুধর্মেরই একটি অংশ। এর দ্বারা শিখধর্ম যে একটি পৃথক ধর্ম তা অস্বীকার করা হয়েছে।

উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারগুলি সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি প্রচার চালাতে হবে। এই সব ভুল ও মিথ্যা প্রচারগুলির জবাব দিতে হবে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। যদি কোনও সত্য অভিযোগ বা সন্দেহ থাকে সেগুলি দূর করার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অত্যন্ত শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে হবে সকলের মধ্যে বিশেষ করে শিখ জনগণের মধ্যে, যে কোনও ধর্মস্থান বা গুরুদ্বার আর কখনই অস্ত্র মজুত করার ঘাঁটিতে পরিণত করতে দেওয়া হবে না। সম্প্রতি স্বর্ণমন্দিরে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার যেন পুনরাবৃত্তি আর না হয়।

কংগ্রেস ও অকালী দলের ভিতর যারা উদার তাদের একটা ঘটনা শিক্ষা নেওয়ার আছে, যে কোনও অবস্থাতেই উগ্রপন্থীদের কোনওরকম সাহায্য বা আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের এটা বোঝা উচিত যে তাদের অনেক কর্মী ও নেতার এখন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের অভাব দেখা দিয়েছে। অন্তত পাঞ্জাবে দেখা গিয়েছে যে সঙ্কটে পড়লে তারা কেউ শিখ বা কেউ হিন্দু হয়ে যান। বহু কংগ্রেস নেতাই সঙ্কটের সময় জীবন বাঁচানোর জন্য উধাও হয়ে গিয়েছেন। সমস্ত বুর্জোয়া জাতীয় দলগুলিকে জাতীয় সংহতিকে তাদের দলের নির্বাচনী স্বার্থে'র ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

বামপন্থীদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তারা তাদের ক্ষমতানুযায়ী যতটা সম্ভব করেছে।একই সঙ্গে তাদের কিছু দুর্বলতাও লক্ষ্য করা গিয়েছে। বামপন্থীরা সম্ভবত আরও বড় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রচার পাঞ্জাবের ভিতরে ও বাইরে চালাতে পারত, বিশেষ করে শিখ জনসাধারণের মধ্যে। এটাও পরীক্ষা করা দরকার যে সব বামপন্থীরা কী তাদের নির্বাচনী স্বার্থের কথা না ভেবে কাজ করেছেন? এটাও

পরীক্ষিত হওয়া উচিত যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বামপন্থীরা তাকে কী সক্রিয় ও শারীরিকভাবে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত।

যাই দুর্বলতা থাক, অমৃতসরে কমিউনিস্টরা সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। যারা শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণিশত্রু তারাও স্বীকার করেছেন যে অমৃতসরে কমিউনিস্টরা সাহসের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করেছেন ও লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। অমৃতসরে সিপিআই হচ্ছে মূল বামশক্তি। সিপিআই (এম) এখানে দুর্বল, তবে তারা সিপিআই-এর সঙ্গেই ছিল।

শেষ একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের জলন্ধর কেন্দ্রের কথা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য রক্ষা ও প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার জন্য তারা খুব ভাল কাজ করেছেন। তবে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে তাদের ধারাবাহিক প্রচার চালানো উচিত, যে ধরনের প্রচার আমি এই নিবন্ধে উল্লেখ করেছি।

মেইনস্ট্রিম

পাঞ্জাব নিয়ে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও অলস বামপন্থীদের মিথ্যা প্রচার

এই নিবন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে অপারেশন ব্লুস্টার ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সৎপাল ডাঙ-এর সেই সময়ে লেখা নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল। সৎপাল ডাঙ ওই সময়ে অসীম সাহসের সঙ্গে খালিস্তানি উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। সিপিআই-এর পাঞ্জাব রাজ্য কমিটির সম্পাদক দর্শন সিং কানাডিয়ান ওই সময়ে উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত হন। পাঞ্জাবে অন্তত দুই শতাধিক সিপিআই সদস্য খালিস্তানিদের হাতে নিহত হন।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি যারা অকালি দলের শরিক তারা একটা প্রচার চালান যে 'ভিন্দ্রানওয়ালে ইন্দিরা গান্ধির সৃষ্টি'। এরকম নির্জলা মিথ্যার সমর্থনে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাঞ্জাবের ওই সময়ে ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে আমি পাইনি। সৎপাল ডাঙ-এর একাধিক নিবন্ধ এবং তাঁর লেখা বই 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন পাঞ্জাব'-এও এরকম কোনও তথ্য আমি পাইনি। যে কথা বলা যেতে পারে যে পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার ওই সমস্যাটি ঠিকমতন মোকাবিলা করতে পারেনি। যার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তিনি এটা জানতেন যে স্বর্ণমন্দিরে সেনা পাঠানোর ফলে ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য' ও এর ফলে শিখদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে। তা সত্ত্বেও তিনি সাহসের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক এই কদর্য পরিকল্পনায় আঘাত করেছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অপারেশন ব্লুস্টার-এর এক সপ্তাহ পরে ধর্মতলায় পশ্চিমবাংলার অকালি নেতা বচ্চন সিংহ সরল আহুত শিখদের এক সমাবেশে সিপিআই (এম) নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বক্তৃতা দেন। ওই বক্তৃতায় তিনি অপারেশন বুস্টার-এর জন্য ইন্দিরা গান্ধির তীব্র সমালোচনা করেন ও বলেন, 'তিনি স্বর্ণমন্দিরে সেনা পাঠিয়ে শিখদের ভাবাবেগকে আহত করেছেন'।

গত ৩১ মার্চ , ২০১৬ বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'প্রশ্ন তুলুন, বিনিময়ে পাবেন একাকীত্ব' শীর্ষক নিবন্ধে দিল্লিতে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রদত্ত প্রখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্তের একটি ভাষণের উল্লেখ করেছেন। ওই ভাষণে উৎপলবাবু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, অকালি পন্থ, ভিন্দ্রানওয়ালের দমদমি তাকসাল কারও কোনও সমালোচনা না করে ইন্দিরা গান্ধিকে আক্রমণ করেন। উৎপলবাবু কী বলেছিলেন তা বিস্তারিত লিখছি না। বহুল প্রচারিত আনন্দবাজার পত্রিকায় কৌশিকবাবুর জবানিতে তা প্রকাশিত হয়েছে। একথাই বলার যে পাঞ্জাবের বাইরে উৎপলবাবু বা কৌশিকবাবুর মতন অসংখ্য কমিউনিস্ট বা বামপন্থীরা অপারেশন বুস্টার নিয়ে যা বলেন তা বিজেপি-অকালি জোটের বক্তব্য। অকালি দল ভিন্দ্রানওয়ালেকে শহিদ বলে ঘোষণা করেছে। আমি গত ২০১২ সালে পাঞ্জাবে শিখধর্মের বিশিষ্ট গুরুদ্বারগুলি সফর করে দেখেছি প্রতিটি গুরুদ্বারে ভিন্দ্রানওয়ালের ছবি বিক্রি হচ্ছে ।তাঁর মুদ্রিত বাণী প্রচারিত হচ্ছে ।

পাঞ্জাবে কমিউনিস্টদের বিজেপি-অকালি ধর্মভিত্তিক জোটের বিরুদ্ধে যখন জীবন বাজি রেখে লড়তে হয়েছে, তখন দুটি প্রধান কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে বৃহত্তর জোটে অকালিদের সঙ্গী হয়েছেন ১৯৮৯ সালে। এর ফলে অসীম আত্মত্যাগ সত্ত্বেও পাঞ্জাবে কমিউনিস্টরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। এই নির্মম সত্যটি জীবনের সায়াহ্নে এসে হরকিষান সিং সুরজিৎ বুঝতে পেরেছিলেন। তখন যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আর সৎপাল ডাঙ তো বহু আগে থেকেই এই ভ্রান্ত রাজনীতি ও রণকৌশলের কথা বলে এসেছিলেন।

(ক্রমশ)

বন্ধুতার পাতা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বকসা জেলে বন্দী
সুবোধ মুখোপাধ্যায়।
সহবন্দী আবদুর রেজ্জাক
খান। দিল খোলা হাসি
আর প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে
জড়িয়ে রেখেছেন বকসা
জেল॥
খান সাহেব বকসা জেলের
আদি যুগের লোক। প্রায়
দু যুগ আগে ইংরেজ
সরকার এই পান্ডব বর্জিত
দেশে 'এখানে যে ক'জন
বেয়াড়া দেশভক্তকে নির্বাসনের
দণ্ড দিয়ে পাঠায়, তাদের
মধ্যে ছিলেন খান সাহেব।
স্বাধীনতার জন্য যত আন্দোলন
হয়েছে প্রত্যেকটি ঐ আন্দোলনের
সঙ্গে তিনি জড়িত।
খিলাফতে তিনি ছিলেন, কংগ্রেসে
তিনি ছিলেন, শ্রমিক আন্দোলন
আর কৃষক আন্দোলনের বীর
সেনা থেকেও তিনি
আছেন॥
আড্ডায় বসে খান সাহেব
পুরনো দিনের বিচিত্র কাহিনী
যখন বলেন, তখন মুগ্ধ
হয়ে সবাই শোনে॥

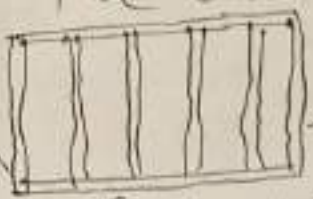

সুবোধ মুখোপাধ্যায়, যখন
যেখানে, ১৯৫৮।

১৯৫৩। দুই বাংলায় হিন্দু
মুসলমান সংঘাত॥
গান ভালবাসার মানুষ
মহসিন ও গান শুনতে
পূর্ব বাংলা থেকে এসে
পাড়ায় আক্রমণের মুখে
পড়লেন। আশ্রয় দিলেন
সাগর। ঋত্বিক ঘটকের
লেখা গল্প 'সাঁকো' নিয়ে
নাটক করছেন 'রূপতাপস'
নাট্য দল॥
এই সময় নভে ২০২৬

(২)

জাভেদ আখতার মনে
করেন কলকাতা শহরের
সাথে তার যোগ
অনেকখানি।
এবার পি. সি. চন্দ্র
পুরস্কার নেওয়ার সময়
বলে গেলেন॥
বই সময় নভে ২০২৬

এই প্রথম বাংলাদেশের
সিনেমায় অভিনয় করলেন
দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, ছবির
নাম 'প্রিজন'। সহ
অভিনেতা বাংলাদেশের
শাকিব খান।
দিব্যেন্দু বললেন — শাকিব
খানকে বাংলাদেশের
'মেগাস্টার' বলা হয়।
একসাথে খাওয়া দাওয়া
আড্ডা আর কাজ
সব কিছু দারুন উপভোগ
করেছি।
১২ মে ২০২৬ বই সময়

হিন্দি সিনেমার নামকরা নায়িকা
মীনা কুমারী। আসল নাম
মেহজাবিন বানো।
তখন হিন্দি সিনেমায় মুসলমান
অভিনেতা অভিনেত্রীদের হিন্দু
নাম রাখা হতো।
মেহজাবিন বানো মীনা কুমারীর ছবির
কেরিয়ার লেদারফেস বিজয়
ভাট। কখনও বি. আর. চোপড়া,
সহ অভিনেতা অশোককুমার,
সুনীল দত্ত।
পুরস্কার পেয়েছেন ফিল্মফেয়ার
অ্যাওয়ার্ড, কান চলচ্চিত্র উৎসবে
পুরস্কার॥
মীনা কুমারী, অবন্তিকা পাল,
রোববার, ৮ মার্চ ২০২৬

'আনন্দলোক' পত্রিকার
২৫ এপ্রিল ২০২৬ সংখ্যায়
আশা ভোঁসলেকে শ্রদ্ধা
জানিয়ে লিখেছেন
অভিনেত্রী জিনাত আমান॥

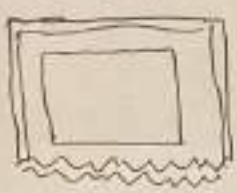

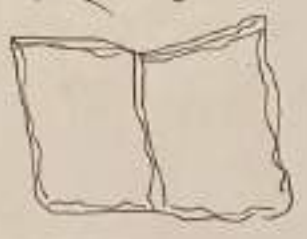

৩

৬ এপ্রিল ২০২৫ / পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত স্মৃতি সঙ্গীত উৎসবে গান গাইলেন কৌশিকী চক্রবর্তী। সারেঙ্গীতে সঙ্গত করলেন উস্তাদ মুরাদ আলি। সরোদ বাজালেন উস্তাদ আমজাদ আলি খান। তবলায় সঙ্গত করলেন পণ্ডিতগণ ও সেবাব্রত আচিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা / ২৯ মে ২০২৫

১৪ মার্চ বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা আমীর খানের ৬০ বছরের জন্মদিনে তার বাড়িতে এসেছিলেন অভিনেতা ভি. কি. কৌশল, রিতেশ দেশমুখ, জেনেলিয়া ডি সুজা সহ অনেকে !

এই সময় ১৬/৩/২৫

শ্রী চৈতন্যের প্রেমধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সহজ ভাবসাধনায় সঙ্গীতিক হয়েছিলেন বহু হিন্দু, মুসলমান বাউল কবি। তাদের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গীতিকার ও গায়ক লালন সাঁই এর নাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৩ এপ্রিল ২০২৫

সুন্দরবনের কে. প্লটে হিন্দু মুসলমান একসাথে মনসা পূজো করে !!

বনবিবির পূজো শুরু থেকেই মুসলমান হিন্দু একসাথে করে।

সূত্র : সুন্দরবনে কাজ করে আমার বন্ধু পার্থ ও কাকন

৪

গণবিজ্ঞান সমন্বয়
কেন্দ্র। দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৯১
১৬ ও ১৭ অক্টোবর
শ্রীরামপুর।

প্রস্তাব —

১৯৯০-৯১ সালে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের প্রেক্ষিতে এই সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে কাজ করার কথা বলা হয়। বলা হয় — এগুলি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন করতে হলে এখনই প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহের কাজ। আগামী দিনে প্রতিটি গণবিজ্ঞান সংগঠনকে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে, নইলে আগামী দিনে সমন্বয় কেন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকবে না।

তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি আগামী দিনের কর্মসূচি হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা হয়।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় ছবি আঁকতেন প্রখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোর। একটি সংখ্যায় সোমনাথ হোর ছবি এঁকেছেন শিল্পীর দুজন কবিগান শিল্পী রমেশ শীল ও শেখ গোমানি। লেখার সাথে আঁকা ছবি। লেখা আছে — বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নতুন বৈশিষ্ট্যের সূচনা। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বাংলার প্রায় সমস্ত জেলা থেকে নির্বাচিত দুই শতাধিক শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে যে কবিগানের ব্যবস্থা হয়েছিল, চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও ফণি বড়ুয়া এবং মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানি ও লম্বোদর চক্রবর্তী কবিগান গাইছিলেন।